ক্ষণকাল

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রকাশক
শ্রীরবীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্য-ভারতী প্রকাশনী
১৪, রমানাথ মজুমদাব ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬০
প্রচ্ছদপট শিল্পী
শ্রীঅনাথ বন্ধু সেন (বুলি)

ব্লক নির্মাতা ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ব্লক এণ্ড প্রিণ্টারস লিঃ
৭৪, আমহার্ষ্ট রো
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর
শ্রীবিভূতি ভূষণ কয়োড়ী
কয়োড়ী প্রেস
২৭, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন।
কলিকাতা—৬

মূল্য তিন টাকা

সুধাংশু'র উদ্দেশে

"ক্ষণকাল" সন ১৩৫৯ সালের শারদীয়া সংখ্যা "বর্তমান" পত্রিকায় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির রচনাকাল সন ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাস। সামান্য পরিবর্দ্ধিত আকারে বইখানি প্রকাশ করা হ'ল। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্বেও বইখানিতে কিছু কিছু ছাপার ভুল থেকে গেছে। সেজন্য পাঠক পাঠিকা'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি। প্রচ্ছদ পট রূপায়িত করেছেন নিষ্ঠাবান শিল্পী শ্রীঅনাথ বন্ধু সেন (বুলি)। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে মৌখিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেই সম্বন্ধকে ক্ষুণ্ণ করব না।

আশ্বিন, ১৩৬০

বিনীত
প্রকাশক

এই লেখকের—
কবিতা :
সুরা ও শোণিত
অশ্রু ও আকাশ
অন্ধকার

ক্ষণকাল

অবশেষে ট্রেণ ছাড়ল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সোমনাথ। ভীড়ে আর গরমে এতক্ষণ দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তবু একটু হাওয়া পাওয়া যাবে।

গাড়ী যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ চিন্তা করবার অবকাশ ছিল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাত্রী এসে ঢুকেছে পিল্‌পিল্‌ করে। কাম্‌রাটিতে তিল ধারণের স্থানও নেই। ফুটবোর্ডে বাদুড়-ঝোলা হয়ে কোনরকমে যারা আছে তাদের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। এদের সকলকে পাশ কাটিয়ে কতোটুকু হাওয়া সোমনাথের কাছ পর্যন্ত পৌঁছবে। এই অসম্ভব ভীড়ে বাইরের সেই মুক্ত ও শীতল বাতাস কি গরম হয়ে উঠবে না?

উঠবে বৈকি!

তবু সোমনাথকে চিন্তা করতেই হবে। জীবনের গতিপথে সহসা যে পরিবর্ত্তন ঘটতে যাচ্ছে তার মূল্যও বড়ো কম নয়।

হাওড়ার সেই বাড়ীখানি চোখের সামনে যেন ছবির মত ভেসে উঠছে। অতীতের প্রত্যিটি মুহূর্তের সঙ্গে যে বাড়ীর যোগ গভীর। যে বাড়ীতে একসঙ্গে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত দুই নাটকের অভিনয়ই তার জীবনে অভিনীত হয়ে গেল।···

খুব হাসি পায় সোমনাথের। বিচিত্র এই পৃথিবী আর মানুষ বিচিত্রতর। স্নেহ প্রেম, সুখ দুঃখ, ঈর্ষা ক্রোধ যা এখানে মানুষকে নিয়ত পূর্ণতায় অথবা রিক্ততায়, আনন্দে কিংবা হতাশায়······

চিন্তাস্রোতে ছেদ পড়ল।—"একবার দেশলাইটা দেবেন স্যার?" পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাকে উদ্দেশ করেই বলছেন।

মনে বিরক্তির সঞ্চার হওয়া সত্ত্বেও তার অভিব্যক্তি মুখে যাতে ফুটে না ওঠে সে চেষ্টা সোমনাথ প্রাণপণেই করলে। মৃদু হেসে বললে, দেশলাই ত নেই।

—নেই? না কিনেই চালান নাকি? আমাকে অবশ্য কেউ তা বলতে পারবে না! রোজের খরচ দু'বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই।—গোঁফের ফাঁকে হেসে উঠল লোকটি।

এবার সত্যিই বিরক্ত হ'ল সোমনাথ। একটু কঠিন কণ্ঠেই সে বললে, কি বলছেন আপনি? দেশলাই না কিনে চালাই এ কথার মানে? বিড়ি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসই আমার নেই! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে জানেন না?

লোকটি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয়েছে বলে মনে হল না। অম্লানবদনে বললে, ও, বিড়ি খান না বুঝি? তা বেশ! তাহলে কি নস্যি নেন? তাই এক টিপ্ দিন্ না? প্রাণটা বেরিয়ে গেল যে! তাড়াতাড়ি ট্রেণে উঠতে গিয়ে দেশলাই কেনা হল না। এখন করি কি? লোকের কাছে চাওয়াও দেখছি ফ্যাসাদ!

পাশ ফিরে লোকটার বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে বসাও অসম্ভব। সটান্ সোজা হয়ে বসে আছে সোমনাথ। একচুল এদিকে অথবা ওদিকে নড়বার উপায় নেই। চালের বস্তার মত কাম্‌রার বেঞ্চিতে প্যাসেঞ্জারগুলি যেন সাজানো আছে একটি আর একটিকে অবলম্বন করে।

অপ্রসন্ন মুখেই সে বললে, আমি নস্যিও নিই না।

—এঁ্যা! তাই নাকি? একেবারে 'গুড্ বয়' যে। কোথাকার আম্‌দানি বাবা? মুখখানা দেখি!—লোকটা সত্য সত্যই সোমনাথের মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে ধরলে।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার সোজা হয়ে বসল সোমনাথ। রাগে ও অপমানে সে কাঁপছিল। উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য সে ঘুষি বাগালে।

কিন্তু তার আগেই এক কাণ্ড হয়ে গেল। ওধারের বেঞ্চ থেকে কে একজন সেই লোকটিকে উদ্দেশ ক'রে বললে, মামা যে?

ভিমরুলের চাকে যেন ঢিল পড়ল। মুহূর্তমধ্যে ফুটবোর্ড থেকে, বেঞ্চ থেকে, দণ্ডায়মান যাত্রীর সারি থেকে বহু কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল—মামা যে?

বিস্মিত সোমনাথ ঘুঁষি পাকিয়েই বসেছিল। কি করবে কিছু তার ঠিক করতে পারেনি। যাকে সে ঘুঁষি মারবে সে ততক্ষণে সিটের ওপর উঠে নৃত্য জুড়ে দিয়েছে আর চীৎকার করছে—কোন্ শালারে? আমাকে কে মামা বলে রে?

সারা কাম্‌রা তখন মুখর হয়ে উঠেছে, মামা! ও মামা! আর লোকটি সমান তালে নৃত্য করছে আর অকথ্য গালাগালি দিচ্ছে যাত্রীদের বিশ্রী মুখভঙ্গী করে।

হেসে ফেললে সোমনাথ। এ দৃশ্য দেখে কেউ না হেসে থাকতে পারে না।

চিন্তা করা তার আর হল না। অথচ চিন্তা করাই আজ তার সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন।

পরের ষ্টেশনে ট্রেণ থামতেই মামা দে ছুট্। কোন্ কাম্‌রায় সে গিয়ে উঠল কে জানে, কিন্তু প্ল্যাটফরম্ অবধি মুখর হয়ে উঠল মামা সম্বোধনে আর তার গালাগালিতে।

তবু স্বস্তিবোধ করতে পারল না সোমনাথ। সেই যাত্রীব্যূহ ভেদ ক'রে কি ক'রে কি জানি এক ক্যানভাসার উঠে এলো ভিতরে।

কিছুক্ষণ ধরে চলল হাত-কাটা তেল, নিমের মলম আর দাঁতের মাজনের ব্যাখ্যা!

পরের ষ্টেশনে সেও নামল, কিন্তু সুরু হল আর এক উৎপাত। এই অবস্থাতেও কোন যাত্রীর নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল। সে বারংবার ঢুলে পড়ছিল পার্শ্ববর্তী যাত্রীর ঘাড়ে। সেই নিয়ে সুরু হল বচসা।

গলাবাজিতে দুজনেরই দক্ষতা অসাধারণ। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি কোন ভাষাই কেউ বাদ দিলে না। নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য চোখা চোখা বুলির অবতারণা করলে তারা।

বিস্মিত সোমনাথ শুনলে, এই ঝগড়াতেও তারা টেনে নিয়ে এল গান্ধীজীকে, সুভাষচন্দ্রকে, এমন কি গণতন্ত্র পর্যন্ত।

সে ঝগড়া বোধ হয় মিটত না। কিন্তু হাতাহাতি এড়িয়ে যাওয়া গেল একটি শোচনীয় ঘটনায়। কামরার এক কোণ থেকে একটি লোক করুণ আর্তনাদ ক'রে উঠল, হামারা সব্‌নাশ হুয়া!

সে কি করুণ কান্না আর বিলাপ। লোকটা পাগলের মত মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা ফুলিয়ে ফেললে। যারা ঝগড়া করছিল তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। কামরার সকলেই কিছুটা বিস্ময় আর কিছুটা সহানুভূতি নিয়ে তার দিকে রইল চেয়ে। অনেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে জানা গেল, রোরুদ্যমান লোকটির পকেট কাটা গেছে। সর্বস্বান্ত হয়েছে সে। বিপুল যাত্রীর এই বিচিত্র মিছিলটি হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্যই বোধ করি সমবেদনায় একেবারে মৌন হয়ে গেল।

তারপরেই একসঙ্গে বহু প্রশ্ন এমনভাবে উত্থত হয়ে উঠল যে, লোকটি আর কাঁদবার অবকাশও পেলে না। সর্বনাশ ত তার আগেই হয়ে গেছে এখন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম।

কেউ বললেন, কাঁহা তোম্‌রা পকেট কাটা হ্যায়?

কারো প্রশ্ন, কোন্ তোম্‌রা পকেট মারা হ্যায়?

কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, টেসন্‌মে কাটা হ্যায় না ট্রেণমে?

একজন সুধালেন, ঝুটা বোলতা হ্যায় না সাচ বোল্‌তা হ্যায়?

কোন প্রশ্নের সদুত্তরই লোকটি দিতে পারলে না। বোধ করি দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতায় সে এমনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েল যে, প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর সে দিল যে-উত্তরের কোন অর্থ হয় না।

সোমনাথের মন এমনই বিষণ্ণ হয়ে ছিল। লোকটার অবস্থা দেখে সে এবার ম্রিয়মান হয়ে উঠল।

দ্রুতগতিতে ট্রেণ ছুটেছে। নির্বিকার দুরন্ত গতি। বায়ুমণ্ডলে তীব্র আবর্তের সৃষ্টি করে দীর্ঘকায় সরীসৃপের মত সশব্দে লৌহদানব অগ্রসর হয়ে চলেছে নিজস্ব গতিপথে।

গাড়ীর ভীড় আস্তে আস্তে কমছে এবার। রাত্রির আকাশে ঝলমল ক'রে উঠছে,—লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মালা। এক রহস্যময় ছায়াপথ যেন দৃষ্টির দুরতিক্রম্য ব্যবধানে আকাশ থেকে নেমে এসেছে পৃথিবীতে। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মত মেঘের প্রাসাদ অতিক্রম করে, বহু দূর বনরেখার পাশ দিয়ে, প্রবহমান তটিনীর তটরেখা ধরে সেই পথ শেষ হয়েছে এসে এক অনির্দিষ্ট মায়াপুরীতে। কল্পনায় মনোহর আর আকাঙ্ক্ষায় সুন্দর মায়াপুরী।

একটু আরাম ক'রে বসল এবার সোমনাথ। পা দুটো অনেকক্ষণ একভাবে থাকার জন্য বেশ ফুলে উঠেছে। শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গেছে বলে বোধ হয়।

দাঁড়িয়ে উঠে সে একবার আড়মোড়া ভাঙল।

এইবার স্থির হয়ে বসে সে একটু ভাববে নাকি? না, সে অবসর আর হবে না। পরের ষ্টেশনই স্বরূপনগর। কলকাতা থেকে একশো মাইল দূরে সে চলে এল।

ছোট ষ্টেশন। কেরোসিনের মিটমিটে আলো অন্ধকারকে আরো ঘন করে তুলেছে। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত ক'রে সশব্দে ট্রেণটা গেল থেমে। নেমে পড়ল সোমনাথ।

অত রাত্রিতে এই ষ্টেশনে আর কোন যাত্রী ছিল না। কয়েকমূহূর্ত বিরতির পর নতুন করে ট্রেণখানাও আবার যাত্রা স্থরু করল। ষ্টেশনে যে সামান্য কর্মচাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল গাড়ী ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও মিলিয়ে গেল অন্ধকারের গভীর নীরবতায়।

অপরিচিত দেশ। একটা প্রত্যাশা নিয়ে সে তাকাল সম্মুখে। মনে হল, কতকগুলি ছায়ামূর্তি তার দিকে যেন এগিয়ে আসছে। সে আর অপেক্ষা না করে সেই মূর্তিগুলির দিকেই অগ্রসর হল।

—কোলকাতা থেকে আপনিই আসছেন ত?

লোকগুলি একেবারে সাম্‌নে এসে পড়েছে। সোমনাথের সঙ্গে যে কথা কইলে সে একটি তরুণ। স্বাস্থ্যের দীপ্তি তার সর্বদেহে। গায়ে একটি হাত-কাটা ফতুয়া। হাঁটু পর্য্যন্ত গুটানো ধুতি। শুধু পা। তার সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন ছিল কিশোরবয়স্ক আর একজন প্রৌঢ়।

—হ্যাঁ, আমিই কোলকাতা থেকে আসছি।

সসম্ভ্রমে নমস্কার করে তরুণ বললে, আমরা আপনাকেই নিতে এসেছি।

—কতদূর যেতে হবে আমাদের?—জিজ্ঞাসা করলে সোমনাথ।

—ক্রোশ পাঁচেক এখান থেকে। কিন্তু আপনি যাবেন কি করে?—একটু সঙ্কুচিত হয়ে তরুণ আবার বললে, গোরুর গাড়ীতে যাবেন ত?

—কেন, হেঁটে যেতে অসুবিধা কি?

—অসুবিধা কিছুই নেই। আপনার কষ্ট হবে না?—সলজ্জ কণ্ঠে মৃদু হেসে সে বললে।

—গোরুর গাড়ীতে আরো বেশী কষ্ট হবে।—সোমনাথও হাসল।

—তবে হেঁটেই চলুন। আপনার মালপত্রগুলো গোরুর গাড়ীতে উঠিয়ে দিই। আমরা আগে থেকেই গাড়ী ঠিক করে রেখেছিলুম কি না।”

—গাড়ীতে উঠিয়ে দেওয়ার মত মালপত্র আমার সঙ্গে নেই। তবে গাড়ী যখন ব্যবস্থা ক'রে রেখেছ তখন যা আছে মিছামিছি সেগুলো বয়ে লাভ কি?—সোমনাথ বললে।

— সেই ভালো।—তরুণ বললে, চলুন, এই রশিখানেক দূরে শিবতলায় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। জনার্দন, ওঁর জিনিষগুলো তুমি নাও।

জনার্দন অর্থাৎ সেই প্রৌঢ় লোকটি এগিয়ে এল।

ষ্টেশন পিছনে রেখে সোমনাথ অগ্রসর হল তার সঙ্গীদের নিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। নিদ্রিত পল্লীর নিবিড় প্রশান্তি ভঙ্গ করে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি ডাকছিল। পথের দুপাশে লতাগুল্ম আর কাঁটাগাছের ঝোপে

অন্ধকার উঠেছে জমাট হয়ে। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়ে গেছে।

বেশী দূর যেতে হল না। তারা গিয়ে পড়ল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চওড়া রাস্তায়। গোরুর গাড়ী সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল।

—এই বুঝি স্বরূপনগর?—সোমনাথ বললে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ!—তরুণ উত্তর দিলে।

—আমরা যাব কোনখানে?

—স্বরূপনগরের পর ধুলোগড়, তারপর রূপহাট। রূপহাট থেকে পশ্চিমে বনসিঁড়ি।

বনসিঁড়ি অর্থাৎ বনশ্রীই সোমনাথের গন্তব্যস্থল।

ভারী অদ্ভুত লাগছিল তার। হঠাৎ জীবনে এ কি হয়ে গেল? আজন্ম সহরে মানুষ সে। নাগরিক আবেষ্টনে পরিবর্ধিত হয়েছে ধীরে ধীরে। শিক্ষা, দীক্ষা, ও রুচিবোধ সবই সহর থেকে পাওয়া। মানুষের ভীড়, যানবাহনের কোলাহল, ফ্যাসনের চমক, প্রসাধনের চাকচিক্য এতদিন এই সবই দেখে এসেছে। কোনদিন ভাবেনি অকস্মাৎ তাকে চলে আসতে হবে ভীড় থেকে নির্জনে। কোলাহল থেকে নীরবতায়। প্রসাধন-পুষ্ট কৃত্রিম সভ্যতার মর্মস্থল থেকে উলঙ্গ প্রকৃতির আলিঙ্গনে।

তবু, এই আকস্মিকতাই সত্য। যেমন সত্য তার জীবনের দুর্ঘটনাগুলি। যেমন সত্য তার জীবনে অভিনীত দুখানি নাটক। যার প্রথমখানি মিলনান্ত, দ্বিতীয়খানি বিয়োগান্ত।

গোরুর গাড়ীতে মালপত্র দিয়ে তারা এগিয়ে এসেছে। তার আগে আগে চলেছে সেই তরুণ, লাঠি আর হ্যারিকেন নিয়ে। পিছনে সে। এতক্ষণে চিন্তা করবার অবকাশ মিলেছে তার। কিন্তু শ্রান্ত মস্তিষ্কে বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা জট পাকিয়ে হয়ে উঠছে জটিল। পূর্বকথার স্মৃতিতে মন ভারাক্রান্ত। এক একবার সহরের সঙ্গে সম্পর্ক

শেষ করে আসার জন্য সেই সম্বন্ধের যোগসূত্র অন্তরের অন্তঃস্থলে সৃষ্টি করছে আলোড়ন। আবার আজকের এই নতুন ও বিচিত্র পরিবেশ থেকে থেকে চিত্তকে করে তুলছে উদাস।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা শেষ করে আবার তারা পা দিলে সরু ও সর্পিল পথে। কোথা থেকে এসে তাদের সঙ্গে এবার যোগ দিলে একটি নদী। বেশী প্রশস্ত নয়, কিন্তু প্রখর স্রোতবতী। সোমনাথদের বামে রেখে সেই নদী বয়ে যাচ্ছিল অশ্রান্ত কল্লোলের আস্ফালনে।

—এই নদীটির নাম কি?—সোমনাথ জিজ্ঞাসা করলে।

—আমরা এখানে একে ধাত্রী বলি।—তরুণ উত্তর দিলে।

—ধাত্রী? বেশ নামটি ত?—আপনমনেই বললে সোমনাথ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আসলে এটি গঙ্গার শাখা। কিন্তু শুধু নামে নয় কাজেও এই নদী আমাদের ধাত্রী। এ নদী না থাকলে অন্তত এখানকার পঞ্চাশখানা গ্রামের কোন অস্তিত্ব থাকত না। আবার এর ক্রোধও ভয়ঙ্কর। সেই ক্রোধকে প্রতিরোধ করবার জন্যই আপনাকে আজ কোলকাতা থেকে ছিট্‌কে আমাদের মধ্যে এসে পড়তে হল।

ছেলেটির কথাবার্তায় ক্রমশই সোমনাথ আকৃষ্ট হচ্ছিল। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত কথা। প্রথমে শুধু-পা আর ফতুয়া-গায়ে তাকে দেখে সাধারণ গ্রাম্য ছেলে বলেই তার বোধ হয়েছিল। কিন্তু সে তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে কথোপকথনে।

সোমনাথ বললে, ও। এই নদীরই বাঁধ হবে বুঝি?

—হ্যাঁ।—তরুণ বললে।

—তুমি কি 'বনশ্রী গ্রামরক্ষা সমবায়ে'র সভ্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার নামটি ত এখনো জানতে পারলুম না?

—আমাকে শশী বলে ডাকবেন।

—বেশ।—সোমনাথ বললে, এই ধাত্রীর বন্যা থেকে বনশ্রী ও আরো কতকগুলি গ্রামকে বাঁচাতে হবে বাঁধ দিয়ে। যতদূর জানি, এই তোমাদের প্রথম পরিকল্পনা। কিন্তু তারপর কি? শুনেছি তোমাদের আরো বহু পরিকল্পনা আছে।

—আছে।—শশী বললে, সে সব শুনবেন দেবীর কাছে। আমি যেটুকু জানি সেটুকু এই যে, বনশ্রী ও আশে পাশের অন্য গ্রামগুলোকে সব দিক দিয়ে উন্নত আর জীবন্ত করে তোলাই আমাদের লক্ষ। আর সে কাজ আমরা, অর্থাৎ গ্রামবাসীরাই করব।

—তোমাদের যে নেত্রীর কথা আমি শুনেছি তাঁকেই বোধ হয় তুমি দেবী বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা সকলেই তাঁকে দেবী বলি।

সোমনাথও শুনেছে এই দেবীর কথা। কোলকাতায় বিকাশদা তাকে বলেছে। এই আশ্চর্য্য মেয়েটির প্রতি বিকাশের শ্রদ্ধা অসীম:

—তুই জানিস্‌না সোমনাথ, কি অসাধ্য সাধন করতে নেমেছে এই মেয়েটি।

কিন্তু বিকাশদা, তুমি আমাকে সেখানে পাঠাচ্ছ কেন? গড়বার কাজ জীবনে আরম্ভ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। নিজের সংসার নিজেই গড়তে গিয়ে ভেঙে ফেলেছি। আমাকে আবার গড়ার কাজে কেন? বরং যদি ভাঙার কাজ কিছু সংগ্রহ করতে, হয়তো তাতে সার্থক হতে পারতুম। গত যুগে যখন রাজনৈতিক ডাকাতি করেছি, বোমা আর পিস্তল নিয়ে ঘুরেছি, জেলখানাকে এড়িয়ে আত্মগোপন করে দিন কাটিয়েছি, তখন ত এমন উদ্যমহীন হয়ে পড়িনি। আর আজ গড়তে গিয়ে আমি নিজেই ভেঙে পড়েছি। তাই গড়ার কাজে নতুন করে হাত দিতে ভয় হয়।

মৃদু হেসেছে বিকাশ : ভাঙার কাজে যে যোগ্যতা অর্জন করেছে, গড়ার কাজে সে ভয় পাবে কেন? ও দুটির মধ্যে নীতিগত অথবা প্রকৃতিগত পার্থক্য যাই থাক্ না কেন, দুটি বস্তুই মূলত এক বলেই আমার ধারণা। জীবনে যেমন সংগ্রামই মুখ্য বলে পরিগণিত, তা সে সংগ্রামে জয় অথবা পরাজয় যাই আসুক না কেন, কর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি কর্মের প্রকৃতি বিচারে নয় যোগ্যতার পরিচয় দেওয়াতেই কর্মীর সার্থকতা।

কিন্তু বিকাশদা, সকলের দ্বারা কি সব কাজ হয়?

হয় বৈকি।—হেসেছে বিকাশ, যে মেয়েটির কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি তাকে দেখেই বুঝতে পারবে যে কাজ আর খেলা এ দুটি ভিন্ন জাতীয় জিনিষ নয়। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি সোমনাথ, যে-কোন কঠিনতম কাজও সম্পন্ন করবার জন্যে গৌরী ছোট্ট একটা মেয়ের মতই আনন্দে ও কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কোথা থেকে এঁকে সংগ্রহ করলে বিকাশদা?

গম্ভীর হয়ে গেছে বিকাশ। অনেকক্ষণ পরে বলেছে, তার সম্পূর্ণ পরিচয় এখন তোমার শুনে কাজ নেই। শুধু এইটুকু জেনে রেখো, মেয়েটির ভাগ্য তাকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চনা করেছে। তারপর সময় হলে সব কথা জানতে পারবে।

এইটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সোমনাথ জানত বিকাশদাকে আর কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত হবে না।

গৌরীর সম্বন্ধে একটা কৌতূহল নিয়েই সে বনশ্রীতে আসছিল। পথে শুনতে পেলে গৌরী রূপান্তরিত হয়েছে দেবীতে।

তিনটি কিশোর আর জনার্দন আগে আগে যাচ্ছিল। মিশকালো অন্ধকারে তাদের কালো চেহারাগুলো মিশে গেছে। দূরে শুধু আবছায়া ছায়ামূর্তির মত দেখা যায়। সে আর শশী চলছে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে। গোরুর গাড়ীখানা কত দূর পিছনে পড়ে আছে কে জানে।

ধূলোগড় ছাড়িয়ে গেলুম আমরা।—শশী বললে।

চেয়ে দেখলে সোমনাথ। তারা এসে পড়েছে বিরাট একটা প্রান্তরে। ধাত্রী এখানে ঈষৎ প্রশস্ত। নদীর তটভূমি ঘেঁষে সরু পায়ে চলা পথ। তার একদিকে মাঠ, অন্য দিকে নদী। দুদিকেই উদার আকাশের অগাধ স্পর্শ।

—এ জায়গাটাকে কি বলে? রূপহাট?

—আজ্ঞে রূপহাট এখনো আমরা আসিনি।—শশী বললে, ধূলোগড় আর রূপহাটের মাঝখানে এই মাঠখানা পার হতে হয়। তা ক্রোশখানেক হবে মাঠটা।

মাঠ পার হ'ল সোমনাথ। আবার সেই সরু ও শীর্ণ পথ। তার এক দিকে ধাত্রী অন্যদিকে লতাগুল্ম ও কাঁটাগাছের ঝোপ।

এখানে কি ক'রে দিন কাটবে সেই কথাই ভাবছিল সোমনাথ। গ্রামে সে অনেকবার গেছে, কিন্তু তিনরাত্রির বেশী কোথাও কাটায়নি। আর আজ ঘটনাচক্রে গ্রামেই আসছে সে বাস করতে। 'বনশ্রী গ্রামরক্ষা সমবায়'এর অনেক কাজের পরিকল্পনা আছে। তারা কতকগুলি আদর্শ গ্রাম তৈরী করবে। সেই কাজে সোমনাথকে নিয়োজিত করতে হবে তার সমস্ত উদ্যম আর অধ্যবসায়। গৌরী বিকাশের কাছ থেকে একজন উপযুক্ত লোক চেয়েছিল। সোমনাথ ছাড়া উপযুক্ত লোক বিকাশ নাকি আর খুঁজে পায়নি।

এই ভালো! এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারত না। অদৃষ্ট তাকে নির্বাসিত করেছে সহর থেকে। বিচ্ছিন্ন করেছে আত্মীয় পরিজনের সম্পর্ক। বিচ্ছেদের বেদনায় হৃদয় তার বিধুর। এর চেয়ে ভালো আশ্রয়স্থল সে আর কোথায় পাবে?

অভিমানে তার বুকের ভিতর উদ্বেল হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে, একদিকে আদর্শ-পালনের কঠোর অঙ্গীকার আর এক দিকে একটি সংসারকে গড়বার জন্য কি বিপুল অধ্যবসায়। বাবা মারা

গেলেন, তখন তার বয়স একুশ। বিধবা মা আর ছোট ছোট সাতটি ভাই-বোন। বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সে তখন দুর্গম ও ক্ষুরধার পথে অগ্রগামী। কিন্তু সংসারের সে একমাত্র অবলম্বন। ঋণভর্জর অসহায় সংসার!

বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। বাকী ট্যাক্সের দায়ে মিউনিসিপ্যালিটি থালাবাসন ক্রোক করে নিতে আসছে। পরণে জামা পর্যন্ত নেই। শুধু ধুতি একখানা পরে খবরের কাগজ বিক্রী করছে সোমনাথ। রাত্রি জেগে ঠোঙা গড়ছে। আর যেখানে-সেখানে অপমানিত হচ্ছে দেনার দায়ে।

কোনরকম ক'রে একবেলা, তাও জোটে না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সোমনাথ। ছোটভাইগুলোকে স্কুলে দিতে হবে। বোন দুটোর বিয়ে দিতে হবে। তার জন্য সব করতে রাজী আছে সে। পরিশ্রম দিয়ে গড়বে সংসার। ইন্সিওরের দালালী, প্রাইভেট্ ট্যুইসন কোন কাজই সে বাদ দেয় না। পরিশ্রমের স্বেদবিন্দুর বিনিময়ে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আসে সাফল্যের সিংহদ্বারের কাছে।

গ'ড়ে ওঠে সুখের সংসার।

ট্যাক্স মিটিয়েছে। ঋণ থেকে পেয়েছে মুক্তি। ভাইগুলোকে স্কুলে দিয়েছে। একটা বোনের বিয়েও দিয়েছে। গর্বে বুকখানা ভরে যায়। সংসারটা সে দাঁড় করালে। তার জীবনের মিলনান্ত নাটক!

কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের গর্বই বুঝি চূর্ণ হয় সর্বাগ্রে। নচেৎ যে সংসার তার নিজের হাতে গড়া, সেই সংসার নির্মম হাতে তাকেই ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিলে কেন? ক্ষণকালের ক্ষণিক বিদ্রূপ?

হঠাৎ চমক ভাঙে, শশী বলছে: রূপহাট ছাড়িয়ে যাচ্ছি আমরা। ধাত্রী এখানে পশ্চিমে বেঁকেছে। আমরাও পশ্চিমে বেঁকছি।

আবিষ্টের মত এতক্ষণ চলছিল সোমনাথ। অনেকক্ষণ পরে চিন্তার একাগ্রতা তার চৈতন্যকে তন্ময় করে তুলেছিল। হঠাৎ যেন সে নেমে এল পৃথিবীতে।

বিস্মিত হল সে। অরণ্য কোথা থেকে এল? লতাগুল্ম আর কাঁটাগাছের ঝোপগুলোকেই মনে পড়ছিল। কখন তারা মিলিয়ে গেছে। সেখানে আবির্ভূত হয়েছে দূরপ্রসারিত গম্ভীর অরণ্যানী।

ধাত্রী ঠিকই বয়ে চলেছে। বাঁকের মুখ থেকে সে হয়েছে প্রশস্ততর।

শেষ রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। প্রভাতের আর বিলম্ব নেই। অরণ্য মুখর হয়ে উঠেছে পাখীর ডাকে। শীতল বাতাস বইছে শন্ শন্ করে।

আজ কি নতুন সূর্য উঠবে সোমনাথের জীবনে? মৃদু হাসে সোমনাথ। প্রত্যাশা করতে দোষ কি? ধাত্রীকে আর এই অরণ্যকে সাক্ষী রেখে বনশ্রীতে আজ নতুন সূর্যোদয় হোক।

গৌরী শুধু নয়, সোমনাথকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ছোটখাটো একটি ভীড় অপেক্ষা করছিল। সেই ভীড়ের মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই ছিল।

অগ্রগামী জনার্দন আর তিনটি কিশোর পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিল। ছোট্ট একটি নমস্কার ক'রে সোমনাথ দাঁড়াতেই যিনি প্রথমে এগিয়ে এলেন, তিনি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ একজন। গৌরবর্ণ দেহে শুভ্র উপবীতের গোছা ঝুলছিল। খড়মের শব্দ তুলে এগিয়ে এসে সোমনাথের একখানা হাত ধরে তিনি বললেন, দাঁড়ালে কেন ভাই, ভিতরে এস।

কণ্ঠস্বরে একটা অপূর্ব আন্তরিকতা। প্রসন্ন মনেই সোমনাথ ভিতরে ঢুকল।

দীর্ঘ উঠান পার হয়ে ঘর।—ঘরে আসন আগে থেকেই পাতা ছিল। সম্মুখে দাওয়ার ওপরে জল-ভর্তি গাড়ু। তার মাথায় ভিজে গামছা একখানি পাট-করা। হাত পা ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে বিশ্রাম করে নাও আগে, কেমন?—প্রৌঢ় বললেন।

—বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে সত্যিই!—হেসে বললে সোমনাথ।

— হবেই ত। এতখানি পথ আসা, তার ওপর রাত্রি জাগরণ।

— ওগুলোকে পার আছে, কিন্তু ট্রেণ অসহ্য!—সোমনাথ বললে – যেমনি অসম্ভব ভীড়, তেমনি বিশ্রী গরম।

তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেছিল। এতক্ষণ পরে সেদিকে লক্ষ্য পড়ল প্রৌঢ়ের। তিনি সেই জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, এখন তোমরা এঁকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। আজ বিকাল পাঁচটায় স্কুলের মাঠে জনসভা হবে। সেই সময় তোমরা এঁকে শুধু দেখতেই পাবে না এঁর কথাও শুনতে পাবে। বরং ইতিমধ্যে এই চেষ্টাই কর সভায় যাতে আশপাশের সমস্ত গ্রাম থেকে সকলে এসে যোগদান করে।

জনতার মধ্যে কেউ ক্ষুণ্ণ হল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু প্রৌঢ়ের কথার পর সকলেই আর কালবিলম্ব না করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

সোমনাথের একেবারে সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবার গৌরী।

এমন কিছু দেখতে নয়, শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী তরুণী। একখানা কালো রঙের শাড়ী আর একমাথা চুল মেয়েটিকে কেন্দ্র করে রচনা করেছে অভিনব এক আকর্ষণ। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে খুঁত তার নজরে পড়বে অনেক, কিন্তু সোমনাথ দেখলে তার চোখ।

বিশাল দুটি চোখে অপরূপ দীপ্তি।

—আপনি চা খাবেন ত?—কুণ্ঠিত কণ্ঠে কথা কইলে গৌরী।

—চা আমি খাই না।—সোমনাথ বললে।

—ভালোই হয়েছে। ও ছাই পাঁশ না খাওয়াই ভালো। তুমি শুধু জল খেতে দাও।—প্রৌঢ় বললেন।

—খাওয়ার কথা পরে। আগে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের পালাটা সেরে নিই।—বললে সোমনাথ।

—খাওয়াটাই আগে। এই খাওয়ার সমস্যা নিয়েই না বনশ্রীতে আমরা এতো বড়ো একটা ব্যাপার সুরু করলুম। – হাসলেন প্রৌঢ়।

গৌরী চলে গিছল বোধ করি জলখাবারেরই আয়োজন করতে। ক্ষণকাল পরেই সে ফিরে এল মুড়ি নারকেল আর নারকেলনাড়ু নিয়ে।

—এসব জলখাবার মুখে রুচবে ত ভাই ? সহরের ছেলে কিনা, তাই বলছি।—প্রৌঢ় বললেন।

– রুচবে বৈকি ! – উত্তর দিলে সোমনাথ, জোটেনা বলেই ত দুঃখ।

জলখাবার খেয়ে সত্যসত্যই সে যেন একটু সজীব হ'ল। সামনেই বসেছিলেন প্রৌঢ় আর ঘরের কোণে গৌরী।

—নাও, এইবার পরিচয় কর।—প্রৌঢ় বললেন।

—আপনার পরিচয়ই প্রথমে দিন। ওঁর পরিচয় কিছু কিছু আমি ইতিমধ্যেই পেয়েছি। - সোমনাথ বললে।

গৌরীর মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠল। লক্ষ করলে সোমনাথ।

—আমার একটিমাত্র পরিচয়ই আছে। সেটি হ'ল এই যে আমি দেবীর দাদা।

—আপনার বোন উনি ?

—পাতানো বোন ! পাতানো সম্বন্ধ কিনা, তাই সেই সম্বন্ধ রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর।

—বুঝলুম।—সোমনাথ বললে।

গৌরী মুখ টিপে টিপে হাসছিল। তারদিকে চেয়ে প্রৌঢ় বললেন, হাসবার কি আছে ?

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল গৌরী। তারপর মুখে কাপড় গুঁজে হাসির বেগ থামিয়ে বললে, আর কোন পরিচয় আপনার নেই ?

—না, আর যা আছে তাকে পরিচয় বলা যায় না।

—সে কি ? এতদিন বাদে একথা বললে লোকে কি বলবে ?

—লোকের কথায় আমার ত ঘুম হচ্ছে না।—প্রৌঢ় বললেন।

—ঘুম হোক আর না হোক। আপনার পরিচয় আমিই ওঁকে দোব ; আপনাকে আর দিতে হবে না।—গৌরী বললে।

—বেশ, তাহলে তোমার পরিচয়টা আমিই দিই।

—সে ত উনি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

—কিছু কিছু পেয়েছেন, সম্পূর্ণ নয়।

—রক্ষে করুন। আপনার মুখ থেকে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পেয়ে উনি আমার সম্বন্ধে এমনই একটা কিছু ধারণা করে বসবেন, যে হয়তো এক রাত্রির বেশী আর এই গ্রামেই থাকতে চাইবেন না।

—ইস্ বলো কি ? দেবীর কাছে এসে ?

সোমনাথ পুলকিত চিত্তে উভয়ের তর্কবিতর্ক উপভোগ করছিল। এইবার সে বললে, একরাত্রি নয়, আপনাদের দুজনকে দেখেই অনেকগুলো রাত্রি এখানে কাটাবার লোভ আমার প্রবল হয়ে উঠেছে। আর পরিচয় যা পাওয়ার তা আমি পেয়ে গেছি। দুজনেরই। কষ্ট ক'রে পরস্পরকে আর পরস্পরের পরিচয় দিতে হবে না। যেটুকু বাকী আছে, সেটুকু আমি নিজেই সংগ্রহ ক'রে নোব।

—কোথা থেকে সংগ্রহ করবে ?—প্রৌঢ় বললেন।

—আপনাদের সংসর্গ থেকে।

ঠিক এইসময় শশী এসে প্রবেশ করলে।

—ঢ্যাঁড়া দেওয়া হয়ে গেছে শশী ?—গৌরী বললে।

—দশখানা গ্রামে ঢ্যাঁড়া পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনখানা গ্রাম আমি নিজেই ঘুরে এসেছি। শ্রীচরণ, রাজার গাঁ আর কেশবপুর।

—বেশ ;—গৌরী বললে, যথেষ্ট হয়েছে। তুমি এবার একটু জিরিয়ে নাও।

—জিরিয়ে নেওয়ার সময় কই দেবী? স্কুলের মাঠে মণ্ডপ এখনো তৈরী হয়নি।

—তা হোক, সে ভার সদানন্দ আর সন্তোস নিয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার আবার শরীর খারাপ হতে পারে।

শশীর মুখ দেখে সোমনাথের মনে হ'ল, সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এর পর মণ্ডপ তৈরীর কাজটা সেরে নিতে পারলেই সে সন্তুষ্ট হত সর্বাধিক। কিন্তু সে বিস্মিতও বড়ো কম হল না, শশীর আগ্রহ আর পরিশ্রম করবার শক্তি দেখে। সারারাত্রি জেগে সে এখান থেকে ষ্টেশনে গেছে আর এসেছে। দশক্রোশের ওপর পথ। তারপর তিনটে গ্রাম ঘুরে এসে চাইছে মণ্ডপ বাঁধবার অধিকার।

প্রথম দর্শনেই ছেলেটির প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিল। সে আকর্ষণ গভীরতর হ'ল এবার।

শশীকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গৌরী আবার বললে, তুমি যাও শশী।

কণ্ঠস্বরে আদেশের গাম্ভীর্য ছিল। শশী আর দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

সে চলে যাওয়ার পর সোমনাথ বললে, মণ্ডপ বাঁধবার কাজটা ওকে দিলেই ত পারতেন। বেচারাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে লাভ কি হল?

—কি অসম্ভব পরিশ্রম করে তা জানেন না। অন্ততঃ ওর ক্ষেত্রে সময় সময় কঠোর না হয়ে আমার উপায় নেই। শরীরের দিকটাও দেখতে হবে ত?

—হবেই ত।—কথাটা সোমনাথও স্বীকার করলে।

এবার তার বিশ্রাম করবার পালা। প্রৌঢ় চলে গেলেন। গৌরীও গেল। একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য সোমনাথ শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। কিন্তু ঘুম এল না। মনে তার অনেক প্রশ্ন। অসীম কৌতূহল। কে

এই গৌরী? নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই সে বলতে পারে, গ্রামের মেয়ে সে নয়। কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয়ে এই প্রৌঢ়ের আশ্রয়ে একটি সহরের মেয়ে কি ক'রে এল? সম্পর্ক যে পাতানো সে ত সে কথা নিজের কানেই শুনলে।

গৌরীর আকারে, আকৃতিতে, চলনে, কথাবার্তায়, হাবভাবে এমন একটি স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা আছে যা এই যুগেও কোলকাতা থেকে এতদূরে এই দুর্গম গ্রামে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। শুধু তাই নয়, প্রথম দর্শনে তাকে দেখলেই মনে হয় একটা অসাধারণত্ব তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সে অসাধারণত্ব পীড়াদায়ক নয়। তার মধ্যে অহঙ্কারের অভিব্যক্তি নেই। আত্মস্বাতন্ত্রের মহিমায় মণ্ডিত সেই অসাধারণত্ব। তার সঙ্গী প্রৌঢ়টিও একটি রহস্যময় মানুষ। অনাবিল আর অনর্গল কথার অন্তরালে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত আদর্শের পবিত্র হোমশিখাটিকে অন্তরে তিনি সযত্নে প্রজ্জলিত ক'রে রেখেছেন। মনে হয়, গৌরীর আশ্রয় তিনিই। সত্যই যদি তাই হয়, তাহলে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করবার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই অদৃষ্টে মেলে।

হঠাৎ তার মনে কি ঈর্ষার সঞ্চার হ'ল? জীবনে দু'দুবার সে ব্যর্থ হয়েছে আশ্রয় রচনা করতে গিয়ে, আর গৌরী নিঃসম্পর্ক আশ্রয়ে কেমন আনন্দেই না আছে। অহেতুক এই ঈর্ষার কোন অর্থও সোমনাথ খুঁজে পায় না। শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের রঙচটা ছবি। কি অসম্ভব পরিশ্রমে, অসীম বিশ্বাস আর সুদৃঢ় নির্ভরতা নিয়েই না সে তার সংসারটিকে দাঁড় করিয়েছিল। ভেবেছিল এই সাফল্য জীবনে তার অক্ষয় হয়ে থাকবে।

অক্ষয় ব'লে কিছু নেই একথা কি সোমনাথ জানত না? জানত বৈকি। তবু একটা মোহ যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। একটির পর একটি ধাপ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করেছে সে। ক্ষণ-কালের স্পর্শ কত শীঘ্রই না তার জীবনে এল?

সংসারে সুখের আস্বাদ পেতেই মা ধ'রে বসলেন, সোমনাথকে বিয়ে করতে হবে। সে তাতে রাজী নয়। রাজী না হলে কি হবে? অনুরোধ, অভিমান, অনুনয় কিছুই বাদ গেল না। মনে পড়ে মার আক্ষেপ, বুড়ো হয়েছি আমি, কদিনই বা বাঁচব?

—যে কদিনই বাঁচো, আমার পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিয়ে যেতে চাও কেন?

—ওরে, এখনো বেড়ী না পরালে তুই যে শেষটা ভেসে যাবি।

হো হো করে হেসে উঠেছে সোমনাথ। বলেছে, যদি ভেসেই যাই মা, তোমার তাতে কি? তুমি ত তখন এ জগতে থাকবে না।

—ওরে, তোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে গেলে আমি মরেও শান্তি পাবনা।—কান্নায় আকুল হয়ে উঠেছেন মা কথাটা শেষ ক'রে।

বিয়ে? সোমনাথ ভাবতে বসে সে কি করে সম্ভব? সে যে অন্য পথের পথিক। তার জীবনে সুখের স্বপ্ন যে অর্থহীন।

একথা সে অস্বীকার করবে না, তার অন্তরে একটি মানুষ আছে যে নীড় বাঁধতে চায়। সেই স্নেহপ্রবণ মানুষটিই এই অগ্নিমন্ত্রের পূজারীকে দিয়ে সংসার রচনা করিয়েছে। স্নেহপ্রবণ মানুষটির কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীব্র। না হলে এত শীঘ্র সোমনাথ সংসার গড়ে তুলতে পারত না। মা ও কনিষ্ঠদের প্রতি সে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই পালন করেছে।

কিন্তু এর বেশী আর কেন? তার কর্তব্য ত এইখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। এর পর শৃঙ্খল পরা যে অসহ্যও হবে। জীবনে উদ্দাম স্বাধীনতা তার প্রয়োজন। আত্মরক্ষা, স্বজন পালন এবং দেশের প্রতি কর্তব্যপালন এই তিনটিই যে তার লক্ষ। বিয়ে করলে সে যে লক্ষ ভ্রষ্ট হবে।

না, কিছুতেই মার কথায় সম্মত হওয়া চলে না।

দৃঢ়কণ্ঠে সে জানিয়ে দিলে মাকে তার সিদ্ধান্ত।

মার দিক থেকেও বাড়াবাড়ি চরমে উঠল। তিনি আহার বন্ধ করলেন।

এই জটীল মুহূর্তে সমস্যার সমাধান করলে বিকাশ। হেসে সে বললে, বিয়ে তুই কর্ সোমনাথ।

—কি বলছ বিকাশদা?—বিস্ময়ে সোমনাথের দৃষ্টি দুর্বোধ্য হয়ে উঠল।

—ঠিকই বলছি। তবে একটা সর্ত আছে। পাত্রী নিবাচন করব আমি। তোর মাকে আমার প্রস্তাবে সম্মত হতে হবে।

—মা একথা শুনলে এখুনি লাফিয়ে উঠবে। আমি কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত নই।

—তোকে সম্মত হতেই হবে।—দৃঢ় হয়ে উঠল বিকাশের কণ্ঠস্বর।

—মাফ করো বিকাশদা।—অনুনয় করে বললে সোমনাথ, আমি পারব না। আমার ব্রত নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের আদর্শকে নিজে কি ক'রে হত্যা করব? তোমার কোন আদেশ কোনদিন অবহেলা করিনি, কিন্তু আজ তুমি আমায় ক্ষমা করো।

—এক্ষেত্রে আমি নির্মম, ক্ষমা করতে পারব না।—বিকাশ বললে।

সোমনাথের চোখ দিয়ে টপ টপ করে ঝরতে লাগল জল। কাতর হয়ে সে বললে, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে আদর্শচ্যুত করবে?

বিকাশ হেসে উঠল হা হা ক'রে। বললে, আদর্শ কি এতই ঠুন্‌কো জিনিষ যে বিয়ে করলেই তা কাচের বাসনের মত ভেঙে যাবে? আমি তোর এমন বিয়ে দোব যাতে তোর আদর্শ সফল ক'রে তোলবার জন্য তুই একটি সঙ্গিনী পাবি। তোর ব্রত সার্থক ক'রে তুলতে আমি সংগ্রহ করব এক ব্রতচারিণী। তোরা দুজনে একসঙ্গে অগ্রসর হবি একপথে। কেমন, আর আপত্তি আছে?

বিস্মিত হ'ল সোমনাথ। তার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে বিকাশ বললে, আর আপত্তি করিস্‌নি। তোর পাত্রী নির্বাচন আমি করে রেখেছি। অগ্নিমন্ত্রে পরিশুদ্ধা সে। তুই আদর্শচ্যুত হতে চাইলেও সে তোকে তা হতে দেবে না। তোর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে দুর্গমও ক্ষুরধার পথে, যে পথে তুই পা বাড়িয়েছিস্‌। দে, এবার আমাকে কথা দে।

—আমাদের দলেরই মেয়ে বিকাশদা?

—হ্যাঁ।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। এই বিরাট পৃথিবীতে একটিমাত্র মানুষই আছে যার কথা ঠেলে ফেলা তার পক্ষে অসম্ভব। তার সঙ্গে পরিচয় তার আজকের নয় অনেক দিনের। সময় তার অন্তরে বহু ক্ষতচিহ্ন এঁকে রেখে গেলেও তাকে একেবারে রিক্ত ও বঞ্চিত করে বয়ে যায় নি। একখানি উজ্জ্বল ও অম্লান ছবি ও তাকে দিয়ে গেছে উপহার। 'বজ্রের মত কঠোর আর কুসুমের মতো কোমল' বিকাশদার সেই ছবি।

সে কতদিনের কথা। সোমনাথ তখন কিশোর। স্কুলে পড়তে পড়তে ভর্তি হ'ল বিকাশের স্বেচ্ছাসেবক সংঘে। ভারতবর্ষের আবহাওয়া তখন উত্তপ্ত। সাইমন্‌ কমিশন আসছে দেশে। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা পাওয়ার উপযুক্ত কিনা সে প্রশ্নের সমাধান তারা করবে!

ব্যাপারটা তখন ভালো করে বুঝতেও পারতো না সোমনাথ। স্বাধীনতা সম্বন্ধে মনে অস্ফুট একটা ধারণা হয়তো ছিল। অন্তরের অবচেতন অংশে কিশোর রক্ত তোলপাড় করতো সমুদ্রের সমস্ত আবেগ নিয়ে। মনের সেই অন্ধকারচ্ছন্ন অংশের কোনখানে বিকাশ কেমন করে যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলো আজও সে তা বুঝতে পারে না।

তখন ত কিছুই বুঝত না। দেশ কি? কি তার সমস্যা? কেন স্বাধীনতা চাই? বুঝত একটি মাত্র কথা। দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে হবে।

বিকাশ তার মনে জাগিয়ে দিয়েছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা। লেলিহান বহ্নিশিখার মতো সেই ঘৃণা তার অন্তরের অন্তঃস্থলে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিছল। পরে সেই সংস্কার দৃঢ় মূল হ'ল ইংরেজের কারাগারে। আজো সেই ঘৃণার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি সে। এখনো সে ইংরেজ বিদ্বেষী। তাদের কোন কিছুই সে ভালো চোখে দেখে না। দেখতে পারে না। এমনি একটা সংস্কার তার মনে গড়ে উঠেছে বিকাশের প্রভাবে।

কিশোর স্বেচ্ছাসেবক বিকাশের অধিনায়কত্বে মিছিল করে বেরোত। "সাইমন্ কমিশন বয়কট করো" এই ছিল তাদের ধ্বনি।

সেই সময়কার একটা কথা এখনো মনে আছে। কোলকাতায় সেদিন রয়্যাল কমিশনের আসবার দিন। ভারতবর্ষের সমস্ত দল বলেছে কমিশনকে বয়কট করতে। অভূতপূর্ব্ব আন্দোলনে সারা সহর হয়ে উঠেছে চঞ্চল।

তারাও দল বেঁধে বেরিয়েছিল।

অন্যান্য দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা চেষ্টা করছিল, চলন্ত ট্রামগুলোকে অচল করে দেওয়ার জন্য। তারাও সেই কাজে অংশ গ্রহণ করলে।

একটা ট্রামে উঠতে গিয়ে পুলিশের তাড়া খেয়ে সোমনাথ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তার কাছেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজন সার্জেণ্ট গল্প করছিল। তাদের একজন তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে, হেসে অপরকে বললে, Enemy of Royal Commission!

কথাটা শুনতে পেলে সোমনাথ। শুধু শুনতে পাওয়া নয়, তার গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে গেল সার্জেণ্টের কথায়। ছেলেবেলায় সে খুব রোগা ছিল। তার দুর্ব্বল ও শীর্ণ দেহের দিকে চেয়েই যে সার্জেণ্ট বিদ্রূপ করলে সে কথা সে বুঝতে পারলে। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ম্লান হয়ে গেল।

অবশ্য সার্জেণ্ট উত্তর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই। সোমনাথও জানতো না, কখন বিকাশ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। সার্জেণ্টের কথা শেষ হতেই গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, Not only the enemy of Royal Commission but the enemy of British Imprialism.

কথা শেষ করেই সোমনাথের হাত ধরে সে বললে, চল্ সোমনাথ। ঘাসপটির ট্যাঁস্ ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করবার সময় এখন নেই।

সার্জেণ্ট ডুটোর চোখ জ্বলছিল। সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বিকাশ সোমনাথকে টেনে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

লম্বা চওড়া সার্জেণ্ট ডুটোর সামনে কেমন বিকাশদা বুক ফুলিয়ে জবাব দিলে! শ্রদ্ধায় ভরে উঠল সোমনাথের বুক। কিশোর মন বিকাশের পায়ে যেন মাথা লুটিয়ে দিতে চাইলে। সহজ আবেগে অন্তর গেয়ে উঠল এক অনাড়ম্বর প্রশস্তি। সেই মুহূর্ত্তটি তার জীবনের উদ্বোধন লগ্ন।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে সে বললে, বিকাশদা!

—কিরে?

—আমার শরীরটা কি করে ভালো হবে?

—ও-হাহা করে হেসে উঠল বিকাশ। বললে, ঘাসপটির টেঁস্থুর কথা এখনো মনে আছে দেখছি? থাকাই দরকার।—কিছুক্ষণ কি ভাবলে সে। তারপর বললে, শুধু ভলাণ্টিয়ারী আর তোকে দিয়ে করাব না। তুই নিয়মিত কাল থেকে আমাদের সংঘে আসিস্।

—এলে স্বাস্থ ভালো হবে ত? গায়ে জোর হবে?—সোমনাথ চঞ্চল হয়ে উঠল আনন্দে ও উৎসাহে।

হেসে বললে বিকাশ, শুধু গায়ের নয়, মনেরও জোর হবে। বুক ফুলিয়ে কাকেও মুখের মতো জবাব দিতে আর সঙ্কোচ বোধ করবি না।

—আমিও তাই চাই।—খুসী হয়ে বললে সোমনাথ।

মিঃ ধাড়া একজন পুলিশ অফিসার। মৃদু হেসে তিনি বললেন, চোখ কান খোলা রেখে কাজ না করলে কি জমিদারী চালানো যায় ম্যানেজার বাবু?

ম্যানেজার বাবু মনে মনে মিঃ ধাড়ার মুণ্ডপাত করছিলেন। চোখ কান খুলে রেখেই কাজ করেছেন তিনি। এমন কিছু হয়নি যার জন্য এতখানি হৈ হৈ করতে হবে। এ যেন 'মশা মারতে কামান দাগা' হচ্ছে। মুখে তিনি আর কিছু বললেন না। চাকরীর মায়াটা আছে।

রায়চৌধুরী বললেন, এমাসে পণ্ডিতের বৃত্তি কি দেওয়া হয়েছে?

—না, এখনো নিতে আসেননি।—কম্পিত কণ্ঠে বললেন ম্যানেজার।

—নিতে এলে জানিয়ে দেবেন এমাস থেকে বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

—আজ্ঞে এ যে পুরুষানুক্রমিক বরাদ্দ।—কথা বলতেই হ'ল ম্যানেজারকে।

—হোক পুরুষানুক্রমিক বরাদ্দ।—এক ধমক দিলেন রায়চৌধুরী, আমার বুকের ওপর বসে আমারই দাড়ী ওপড়ানো! চলবেনা এসব। তিনদিনে আমি সমস্ত ঠাণ্ডা করে দোবো।

ভয়ে ম্যানেজার আর বলতে পারলেন না যে, এই বৃত্তি বন্ধ করবার অধিকার বর্তমান জমিদারের নেই। দেবোত্তর সম্পত্তির উপসত্ব থেকে এই পণ্ডিতবংশের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি রায়চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে আছে। পরবর্তী উত্তরাধিকারিরা সেই বৃত্তি বন্ধ করতে পারবেন না এই নির্দেশের কথা বর্তমান জমিদারও জানেন। তবু তিনি চুপ করে রইলেন।

মুখ ফিরিয়ে রায়চৌধুরী এবার বললেন, আপনি কতদূর কি ব্যবস্থা করলেন মিঃ ধাড়া?

—সভা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া আর কিছু করা এখন সম্ভব নয়।

—পণ্ডিতকে আর ওই দেবীকে গ্রেপ্তার করতে পারলেন না ?

—ঝপ করে সে কাজ করা সঙ্গত হবে না। আশে পাশের দশ পনেরোখানা গ্রামে ওদের প্রভাব অসাধারণ। এখন শুধু-শুধু উত্তেজনা বাড়িয়ে লাভ নেই। অন্য উপায়ে কাজ হাঁসিল করতে হবে। আমাদের অগ্রসর হতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। তাছাড়া ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে কোলকাতা থেকে একটি বিপ্লবী দলের একজন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে সেই দলের সঙ্গে ওদের সংযোগ আছে।—পরম বিজ্ঞের মত মিঃ ধাড়া মন্তব্য করলেন।

আঁতকে উঠলেন রায়চৌধুরী, এত তোড়জোড় ওরা করলে কবে ?

—উদ্যোগ আয়োজন চলছে বছর খানেকেরও বেশী।—মিঃ ধাড়া বললেন, দেবীই ত এখানে এসে আছে প্রায় দেড় বছর।

—সে কথা আমি জানি।—রায়চৌধুরী বললেন, শুনেছিলুম পণ্ডিতের গুরু নাকি ওকে এখানে পণ্ডিতের আশ্রয়ে রেখে গেছে। মেয়েটার নাকি আর কেউ নেই। কিন্তু ওর যে পেটে পেটে এত শয়তানি তা কে জানত ?

—শয়তানি বলে শয়তানি ?—আর একটি বিশিষ্ট অতিথি কথা কইলেন। ইনি অবাঙ্গালী হলেও বহুদিন বাংলায় বাস ক'রে বাঙ্গালীই হয়ে গেছেন। স্বরূপনগরে বিরাট কারবার তাঁর। তিনি বল্লেন, আমি যতদূর খবর পেয়েছি তাতে একথা বলতে পারি যে, জালটি এরা ফেলেছে একেবারে নিপুন হাতে। ধাত্রীর বাঁধ হবে, বন্যার জল গ্রামে যাতে না ঢুকতে পারে। দশপনেরো থানা গ্রামের সমস্ত চাষের জমী চাষ হবে সমবায় পদ্ধতিতে। আরো কত কি হবে। নিজেদের মধ্যে পঞ্চায়েত তৈরী ক'রে তাদের দ্বারা গ্রামবাসীদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান

করা হবে। বিচার ও শাসনের ভার থাকবে তাদেরই ওপরে। সোজা কথায় জমিদারকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য কোন আয়োজনই বাকী থাকবে না। মুখে অবশ্য সে কথা ওরা বলে না। গ্রামের পুনর্গঠন না করলে এ জাত বাঁচবে না এই ওদের মুখের বুলি।

—এ বুলি না বললে যে চলবে না মিঃ দুগর। -মিঃ ধাড়া বললেন।

—হ্যাঁ। সে ত বটেই।—ঘাড় নাড়লেন দুগর। বললেন, মিঃ রায়চৌধুরীর অপেক্ষাতেই আমি এতদিন ছিলুম। উনি ফিরে এসেছেন, যাহোক ব্যবস্থা একটা এবার করে ফেলতেই হবে।

—নিশ্চয়। খাল কেটে কুমীর আনা কি চলে?—একজন পারিষদ বললে।

—চুপকরো।—বিরক্ত হলেন রায়চৌধুরী। গুরুতর আলোচনার সময় পারিষদবর্গকে অবহেলা করাই তাঁর অভ্যাস। তাদের প্রয়োজন হয় তাঁর স্ফূর্তির সময়। প্রভুভক্ত কুকুরের মত তারা পিছু পিছু ঘুরুক, তাতে তিনি আনন্দই পান। সব সময় তারা সঙ্গে থাকেও, কিন্তু কাজের সময় কথা কইলে তিনি রেগে ওঠেন।

—হিতৈষী এবং বন্ধু হিসাবে সব কথা ওঁকে না ব'লে আমিও পারলুম না।—আর একজন বিশিষ্ট অতিথি কথা কইলেন। ইনি একজন ডাক্তার। ভদ্রলোক খুব উত্তেজিত হয়েই ছিলেন। শুধু এতক্ষণ সুযোগ পাননি কথা কয়বার। উচ্চকণ্ঠেই তিনি বললেন, জানেন মিঃ রায়চৌধুরী,কি ভয়ানক মেয়ে ওই দেবী? ও সকলকে পরামর্শ দিচ্ছে ডাক্তার বয়কট করতে, উকিল বয়কট করতে, জমীদার বয়কট করতে! ওইসব ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মেয়েগুলোকে গ্রাম থেকে যত শীঘ্র দূর ক'রে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। বনশ্রী, রূপহাট, ধূলোগড়, রাজার গাঁ, কেশবপুর এই সব গ্রামগুলো থেকে রোগ যেন কোথায় চলে গেছে! কেউ ডাক্তার ডাকেনা মশাই, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার?

—দেবীর প্রভাবের মূল ওইখানে।—ম্যানেজার বাবু এতক্ষণ পরে থাকতে না পেরে সসঙ্কোচে কথা কইলেন।

—কি রকম?—বললেন রায়চৌধুরী।

—সকলে বলে যে-গ্রামে সে যায়, সেখান থেকেই ব্যাধি নাকি দূরে পালায়।—বুকে একটু সাহস এল ম্যানেজারবাবুর।

—তুক্‌তাক্ জানে নাকি ছুঁড়ি?—একজন পারিষদ আর থাকতে না পেরে কথাটা বলে ফেললে। তার সৌভাগ্য, রায়চৌধুরীর মুখ এবার আর ভ্রুকুটি-কুটীল হ'ল না। বোধ হয় কথাটা তিনি উপভোগ করলেন।

ম্যানেজারবাবুও সুযোগ পেলেন প্রভুর মনোরঞ্জন করবার। তিনি ব'লে উঠলেন, তুক্‌তাক্ জানে ব'লেই মনে হয়। হতভাগা প্রজাগুলোকে কি করেই যে বশ করেছে! মেয়ে-মদ্দ ওর কথায় পাগল। তার ওপর পণ্ডিত নামকরণ করে দিয়েছে দেবী। আর কি, চারদিক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে দেবী দেবী করে।

—হুঁ।—অস্ফুট একটা হুঙ্কার দিলেন রায়চৌধুরী।

মিঃ ধাড়া বললেন, আর কিছুদিন সবুর করুন, চারদিক তোলপাড় হতে হতেই দেবী একেবারে অতলে তলিয়ে যাবেন। আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। অমন কতো দেবীই দেখলুম।

—আপনি এখনো সবুর করতে বলছেন বটে, কিন্তু আমার সবুর সইছেনা।—বললেন রায়চৌধুরী, রক্ত আমার গরম হয়ে উঠছে। আমি ত এখনো মরিনি। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আজ রাত্রেই পাইক্ লাঠিয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ওই দেবীর দলবলকে নিশ্চিহ্ন করে দিই।

—ওই কাজটি করবেন না।—মিঃ ধাড়া বললেন।

—হ্যাঁ, কোন হাঙ্গামের সৃষ্টি না ক'রে কৌশলে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করাই দরকার।—বললেন মিঃ দুগর।

—ঠিক কথা। মিছিমিছি খুন জখম কেন?—ডাক্তার বললেন।

—শুধু ত আপনার দেবীটিকে সায়েস্তা করলে হবে না।—মিঃ ধাড়া বলতে লাগলেন, পণ্ডিতও কম যান না। আগুণে ঘৃতাহুতি পড়েছে বলেই ত আগুণ এত জোর জ্বলে উঠেছে। কিছুই করতে পারত না দেবী, যদি পণ্ডিতের সাহায্য না পেত। পণ্ডিতের নিজস্ব প্রভাব ঐসব গ্রামে ছিল বলেই সেখানে দেবীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর সে গড়েছে দল। ওদের সংগঠন এখন খুবই শক্তিশালী। সেইজন্য আমি অবলম্বন করছি অন্য পথ। সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপরে ছেড়ে দিয়ে আপনারা কিছু দিন চুপ ক'রে থাকুন, এই আমার অনুরোধ।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন রায়চৌধুরী। তারপর বললেন, বেশ, আপনার অনুরোধই থাকবে।

সহসা সেখানকার কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল একটি আগন্তুকের আগমনে। সে একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাবইন্স্পেক্টর। হাঁফাতে হাঁফাতে লোকটা ঘরে ঢুকে মিঃ ধাড়াকে অভিবাদন করলে।

—কি সংবাদ সেন ?—ধাড়া বললেন।

—ওরা একশচুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করছে। সভা আরম্ভ হয়ে গেছে।

—তাই নাকি ?—ধাড়া চম্‌কে উঠলেন। তারপর বললেন, তুমি কিছু ব্যবস্থা করেছ নাকি ?

—কিছুই করিনি স্যার।—সেন বললে, কিছু করতে হ'লে স্বরূপনগর থেকে পুলিস ফোর্স নিয়ে যেতে হয়। ওখানকার থানায় ক'টা পুলিশই বা আছে ? সভায় যা লোক হয়েছে আর উত্তেজনা যে রকম দেখে এলুম, তাতে ওই ক'জন পুলিশ নিয়ে কিছুই করা যাবে না।

—ঠিকই করেছ। তুমি যাও, আমিও এখনি রওনা হচ্ছি। থানায় ব'সেই যথাকর্তব্য স্থির করব।—ধাড়া বললেন।

স্যালিউট করে সেন বেরিয়ে গেল।

ধাড়া উঠে দাঁড়ালেন। রায়চৌধুরী বললেন, দেখলেন ত, ওসব হোমিওপ্যাথিক ডোজের কাজ নয়। একরাত্রি আমি যদি লেঠেলদের নিয়ে বার হই ত সব ঠাণ্ডা ক'রে দিয়ে আসব।

হেসে ধাড়া বললেন, হোমিওপ্যাথিক ডোজ আর অ্যাটম্‌বমের ডোজ একই। মাত্রাভেদে ইচ্ছানুযায়ী কাজ হয়। আমি নিম্নতম ক্রম থেকেই সুরু করেছি। দেখি, কতদূর উঠতে হয়। এখন চললুম মিঃ রায়চৌধুরী।

বেরিয়ে গেলেন ধাড়া।

সোমনাথ সভা থেকে ফিরল মনে একটা উত্তেজনা নিয়ে। যেন তার নেশা হয়েছে। মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করছে। স্থিরভাবে চিন্তা করবার শক্তি পর্য্যন্ত তার নেই। আগে থেকেই তার মন অস্থির হয়েছিল। অশান্তচিত্তে জেগেছিল শুধু অস্বস্তিবোধ। তার ওপর যে জন-সমাবেশ এবং উত্তেজনা সে দেখে এল, তাতে চিত্তের দাহ উঠেছে অসহ্য হয়ে। কাণের ভিতর থেকে গরম একটা উত্তাপ বেরিয়ে আসছে। চোখ দুটো হয়ে উঠেছে টকটকে লাল। মাথার ভিতরকার শিরাগুলো যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

অথচ বিন্দুমাত্র উত্তেজনাও এখানে ছিল না। শুধু পুলিশই সৃষ্টি করলে এই অবস্থার। কি প্রয়োজন ছিল তাদের একশ-চুয়াল্লিশ ধারা জারী করবার? এমন একটা জনসমাবেশকে নিষিদ্ধ করবার কোন অর্থ হয়? কি চেয়েছে জনতা? তাদের গ্রামগুলোকে সুন্দর করে গড়তে। রুদ্ররূপিনী প্রকৃতিকে মানুষের বুদ্ধি আর পরিশ্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে। এতে পুলিশের আপত্তি কিসের? জমিদারেরই বা ক্ষতি কোথা?

একটা বিষয়ে সোমনাথ নিঃসন্দেহ, যে জমিদার ভয় পেয়েছে।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট কতকগুলো লোক হয়তো জমিদারকে প্ররোচিতও করেছে। পুলিশের সাহায্যে জমিদার তাই অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে। একশচুয়াল্লিশ তারই প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু একটা সংগঠনী-শক্তিকে ধ্বংসমূলক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চলেছে জমিদার আর পুলিশ। এই বিরাট সংগঠনকে বিদ্রোহী করে তুললে জমিদারের স্বার্থও কি রক্ষা পাবে? পুলিশের অবশ্য ক্ষতি হবে না। বরং অফিসারদের পদোন্নতি হতে পারে। তাছাড়া তাদের কাজই এই। শান্তির রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা। নিরীহ মানুষকে উৎপীড়ন করা। সত্যকে সম্পূর্ণ গোপন করে পল্লবিত মিথ্যার সাহায্যে একটা অনর্থক বীভৎসতা ডেকে আনা।

তারা করবেও তাই।

কিন্তু এপক্ষের করণীয় কি? যারা গড়তে চায় তাদের যদি হঠাৎ ধ্বংসকারী শক্তিতে পরিণত করা হয়, তাহলে তাদের প্রকৃতিও বদলে যাবে। একথা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। শুধু তাই নয়, লক্ষও যাবে চিরন্তরে হারিয়ে। সার্থকতার বিনিময়ে ব্যর্থতার আবির্ভাব হবে অবশ্যম্ভাবী। আলোর প্রার্থনা ক'রে যারা আগুন পাবে শুধু তাদের সর্বদেহই সেই আগুণে পুড়বে না, সেই বহ্নিশিখাকে তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবেও। পরিণামে ধাত্রীর তটাশ্রিত শান্ত ও স্নিগ্ধ গ্রামগুলি ছারখার হয়ে যাবে।

তাই হয়। বিপ্লবের আগে সংগঠনের কোন অর্থ হয় না। খণ্ডিতভাবে সংগঠনও সার্থকতা লাভ করে না। যারা সেই চেষ্টা করতে যায়, তাদের সাধনা ব্যর্থ হয় এমনিধারা কোন না কোন ষড়যন্ত্রের চক্রান্তজালে আবদ্ধ হয়ে।

শোষিত জন-সাধারণ যখনি কিছু করতে যায়, তখনি তাদের যারা শোষণ করে তারা ওঠে ঘুম থেকে জেগে। শোষণকারী কখনই তার অধীনস্থ মানুষগুলির ক্রিয়াকলাপ ভালো চোখে দেখে না। দেখতে

পারেনা। আকাশে আগুণে-মেঘ দেখে তারা নিজেদের ঘরে আগুন লাগবার আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ সংগঠন প্রচেষ্টাকেও বিদ্রোহ স্থষ্টির প্রয়াস বলে ভ্রম করে। আর সেই ভ্রমের ফল হয় সাংঘাতিক।

কায়েমি স্বার্থ যেখানে ঘাঁটি আগলে ব'সে আছে, সেখানে সেই ঘাঁটিরই অভ্যন্তরে সংস্কার প্রচেষ্টা করতে যাওয়ার মত ভুল আর নেই।

এসব কথা বিকাশদা ত তার চেয়ে আরো ভালো করে জানে। তবে সে তাকে এই কাজের ভার দিয়ে পাঠাল কেন? হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত একটা সন্দেহ সোমনাথের মস্তিষ্কে ঝিলিক মেরে ওঠে।

তবে কি বিকাশদার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন? সেকি এখানকার মাটিতে কৃষক-বিদ্রোহের বীজ বুনে রাখতে চাইছে? দুই আর দুইয়ে চার হবেই সে ত তার অজ্ঞাত নয়।

তাই যদি হয় তাহলে তার হাতের চমৎকার অস্ত্র হয়েছে গৌরী। একশচুয়াল্লিশ অমান্য না করে আজ তার গত্যন্তর কি ছিল? দশ-পনেরো থানা গ্রামের লোক সভায় যোগদান করবার জন্য উন্মুখ, আর হঠাৎ জনসমাবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এ আদেশ নির্বিবাদে গৌরী কি করে মেনে নেবে? এত বড় অন্যায়কে মেনে নেওয়া কি সম্ভব?

পরিবেশ সম্বন্ধে বিকাশদা অত্যন্ত সচেতন। সে জানত বাধা কোন না কোন দিক থেকে আসবেই। আর সেই বাধা অপসারিত করবার বলিষ্ঠ উদ্যমেরও অভাব হবে না। ফলে স্থষ্টি হবেই একটা সংঘাতের।

সেই সংঘাত আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে।

সভায় গৌরীর চেহারা সে দেখেছে। অগ্নিগর্ভ মেঘের মতই তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। যে বজ্র তার অন্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার আভাসমাত্রই দেখা গেছে আজকের সভায়। পাঁচহাজার

লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথা শুনেছে। উন্মাদের মত তার জয়ধ্বনি করেছে।

এই জয়োল্লাসের পিছনে আছে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা।

এখন ওপক্ষ কি করবে? এই বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে কি তারা ত্বরান্বিত করে তুলবে?

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল সোমনাথ। ঘরে প্রবেশ করলেন পণ্ডিত। তাঁর পিছনে গৌরী।

—তুমি বড়ো চমৎকার বলেছ ভাই। তোমার ভাষণ লোকে তন্ময় হয়ে শুনেছে।—পণ্ডিত বললেন।

—তাতে আর লাভ কি হ'ল?—সোমনাথ বললে, যত সুন্দর করেই বলে থাকি না কেন, পরিস্থিতি ত মোটেই অনুকূল ছিল না। সর্বক্ষণই একটা অস্বস্তিবোধ আমাকে পীড়িত করেছে। এমন কি এখনো সে যন্ত্রণা থেকে আমি অব্যাহতি পাইনি।

—সে ত মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।—গৌরী বললে।

হ্যারিকেনের আলো ঘরের অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারে নি। গৌরী যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, সেখানে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশী। তার কথা শুনে সোমনাথ তার দিকে চেয়ে শুধু সেই বিশাল দুটি চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিই দেখতে পেলে।

—মুখ দেখে বুঝতে পারছেন?—হাসল সোমনাথ।

—হ্যাঁ। আপনি সুস্থ নয় বলেই মনে হচ্ছে।—গৌরী বললে, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে। তবু আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা না বললেই নয়। বিকাশদার উপদেশ, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে যেন সব কাজ করা হয়।

—বিশ্রামের জন্য আমি ব্যস্ত নই। আপনি যত ইচ্ছা পরামর্শ করুন না।

গৌরী সেইখানেই বসল। তারপর কয়েক মিনিট কি ভেবে নিয়ে বললে, সভায় আমরা ঘোষণা করেছি, আমাদের পূর্বঘোষিত কার্যক্রমই অনুসরণ ক'রে যাব। আমাদের প্রথম করণীয় হ'ল ধাত্রীর বাঁধ। সেই কাজের উদ্যোগ করতে আমরা ভোর থেকেই লেগে যেতে চাই।

—লাগুন। তাতে আমার আপত্তি নেই।—সোমনাথ বললে. কাজ করবার অবসর যদি পাই, তাহলে কাজ করব না কেন ?

—সম্ভবত অবসর পাব না।—গৌরী বললে।

—আমারও তাই মনে হয়।—মন্তব্য করলে সোমনাথ।

অকস্মাৎ ঘরের আবহাওয়া যেন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হয়ে উঠল। রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম নিঃশব্দ। বাইরে শুধু ঝিঁঝিঁ ডাকছে। বাতাসের শব্দ মাঝে মাঝে সন্ সন্ ক'রে উঠছে।

পণ্ডিত বললেন, বর্ষা আসন্ন। এমনিতেই আমরা দেরী করে ফেলেছি বাঁধের কাজে হাত দিতে। ভেবেছিলুম আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে কাজ করলে বর্ষা আসবার আগেই আমরা সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারব। একসঙ্গে পনেরোখানা গ্রামের লোক এগিয়ে এলে একাজ সফল হতে বেশীদিন লাগবে না। কিন্তু এখন সমস্যা, গ্রামের লোকেরা কাজ করবার সুযোগ পাবে কি না ?

—পাবে না, এই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত ব'লে মনে হয়।—সোমনাথ বললে।

—তাই ব'লে পিছিয়েও যাবে না।—গৌরী বললে, কোন রাজনৈতিক আন্দোলনও নয় আর কোন বে-আইনি কাজও নয়, সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কোন কিছু করবার অধিকার যদি জমিদারের খেয়ালের বশে মানুষকে বিসর্জন দিতে হয় তাহলে তার চেয়ে লজ্জার আর কি আছে ?

—কিছুই নেই।—সোমনাথ বললে, কাজ করতে নেমে পিছিয়ে আসা অসম্ভব।

গৌরী উৎসাহিত হয়ে উঠল। বললে, আপনি তাহলে আমার সঙ্গে একমত?

তার পুলকদীপ্ত কণ্ঠ সোমনাথকে যেন অনেকখানি সজীব করে তুলল। মাথার যন্ত্রণা অনেকখানি কমে এসেছে। দেহটাও যেন হাল্কা বোধ হচ্ছে।

সে বললে, একমত। তবে কাল থেকে শুধু বাঁধের কাজের আয়োজনে লাগলে হবে না। সম্ভব হ'লে আজ রাত্রের গাড়ীতেই কাকেও কলকাতা পাঠানো উচিত। জমিদারের এই খেয়ালের কথা যতশীঘ্র সম্ভব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া দরকার।

—আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম।—গৌরী ব'লে উঠলো, আশ্চর্য, আমাদের দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য রয়েছে। যাই হোক, রাত্রি একটায় কল্‌কাতার গাড়ী। লোক আমার ঠিক করাই আছে। আপনি শুধু বিবৃতি রচনার ভার নিন।

—কাকে পাঠাবেন?

গৌরী ইঙ্গিতে পণ্ডিতকে দেখিয়ে দিলে।

আর কিছু বললে না সোমনাথ।

কাগজ কলম নিয়ে সে বিবৃতি রচনা করতে বসল। তার পাশে বসল গৌরী। পণ্ডিত কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

প্রথম কিছুক্ষণ লিখতেই পারলে না সোমনাথ।

একটা নতুন অনুভূতি হঠাৎ যেন তাকে চঞ্চল করে তুলল।

সংবাদপত্রের জন্য সে বিবৃতি রচনা করতে বসেছে। তার ঠিক পাশে বসেছে গৌরী। তাদের দুজনের মধ্যকার ব্যবধান প্রায় নেই বললেই হয়। গৌরীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস সোমনাথের অঙ্গস্পর্শ করছে। সে মুখ ফিরিয়ে আছে তারই দিকে।

কি লিখবে, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সোমনাথ মুখ তুললো। তারই

মুখের দিকে চেয়ে আছে গৌরী। কি যেন ভাবছে। চিন্তায় এত তন্ময় যে সোমনাথকে মুখ তুলতে দেখেও সে তার দৃষ্টি ফেরালে না।

সোমনাথ মুখ নামিয়ে নিলে। তারপর সে লিখতেও সুরু করলে। পর পর অনেকগুলি সংবাদপত্রের জন্য বিবৃতি রচনা করলে সে। কিন্তু সর্বক্ষণ তার অবনত মুখের সামনে গৌরীর সেই বিশাল চোখের দৃষ্টি যেন উদ্যত হয়ে রইল।

অপরূপ দৃষ্টি। রাত্রির তারার মত উজ্জল আর অন্ধকারের মত গভীর।

লেখা শেষ হ'লে সে যখন প'ড়ে শোনাতে যাচ্ছিল তখন গৌরী বললে, থাক্, আর পড়তে হবে না। আপনার লেখবার সময়েই আমি পড়েছি। বেশ হয়েছে। দাদাকে এবার রওনা ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

আর কিছু না ব'লে উঠে গেল সে। বিস্মিত সোমনাথ চেয়ে রইল তার দিকে। কেন সে এতক্ষণ নিঃশব্দে তার কাছে বসে রইল? পাছে শ্রান্ত সোমনাথ আলস্যবোধ করে সেইজন্য কি সে সতর্ক প্রহরা দিয়ে গেল?

কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিত রওনা হলেন। হ্যারিকেন আর লাঠি নিয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে চলল জনার্দন আর শশী।

যাওয়ার সময়ে পণ্ডিত বললেন, আসি ভাই।

—আসুন দাদা।—সোমনাথ বললে, যদি পারেন ত বিকাশদাকে খবরটা দেবেন।

—সে ত দিতেই হবে।—বললেন পণ্ডিত।

তিনি রওনা হয়ে যাওয়ার পর গৌরী বললে, আর কেন, এবার একটু শুয়ে পড়ুন। আজ আর অবসর পেলুম না, কাল আপনার বাসায় আপনাকে পাঠিয়ে দোব। স্কুলবাড়ীর একখানা ঘরে আপনার থাকবার ঠিক হয়েছে।

এবাড়ীতে নয় ?—সোমনাথ কিছু বললে না, কিন্তু মনের ভিতরটা খচ্ করে উঠল। গৌরীর কাছ থেকে দূরে গিয়ে থাকতে হবে ?

মনকে একবার চোখ রাঙাবার চেষ্টাও করলে সে। গৌরীর কাছ থেকে দূরে থাকলে তার ক্ষতি কিসের ? গৌরী তার কে ? একটি নারীই তার জীবনে ছিল। সে শিপ্রা। সে যেদিন গেছে সেদিন তার সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রতি সমস্ত মোহও তার মন থেকে বিদায় নিয়েছে।

তার চমক ভাঙলো। গৌরী বলছিল, কি ভাবছেন ? আপনি খুব ভাবুক লোক ত ? এখানে এসে পৌছান পর্যন্ত দেখছি শুধু চিন্তা নিয়ে তন্ময় হয়ে আছেন।

মৃদু হাসল সোমনাথ।

—কি ভাবছেন, বলুন না ?

হঠাৎ একি প্রশ্ন ক'রে বস্‌ল গৌরী ?

আত্মসম্বরণ ক'রে সোমনাথ উত্তর দিলে, নতুন পরিবেশ, অভাবনীয় পরিস্থিতি, ভাববার কি কিছুই নেই ?

—হয়তো আছে। কিন্তু অভাবনীয় পরিস্থিতির পূর্ব মুহূর্তেও আপনাকে চিন্তাচ্ছন্ন দেখেছি। সুতরাং পরিস্থিতি নিয়ে যে চিন্তা করছেন না, সে কথা খাঁটি সত্যি।

লজ্জিত হল সোমনাথ। গৌরীর সতর্কদৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারেনি।

তার অপ্রতিভ অবস্থা দেখে গৌরী উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল। মুক্তধারা নির্ঝরিনীর মত সেই হাসি সোমনাথের সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে তুলল।

সে বললে, একদিন জানাব দেবী, আপনাকে আমার চিন্তার কথা। আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

—তা না হয় ক্ষমা করলুম।—গৌরী বললে, কিন্তু আপনি আমাকে

দেবী বলছেন কেন ? ওই নামটি আমার পণ্ডিতদাদার দেওয়া সখের নাম। গ্রামের লোক আমাকে ওই বলেই ডাকে। তা ব'লে ওই নামে আপনি আমাকে ডাকবেন না। ও নামের যোগ্য আমি নই।

—যোগ্য কিনা সে বিচারের ভার ত আপনার ওপর নেই।—সোমনাথ বললে।

—নিশ্চয় আছে।—হঠাৎ গৌরীর কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়ে উঠল। সে বললে, আমি কি, সেকথা আমার চেয়ে বেশি ক'রে আর কে জানে! পণ্ডিতদাদাকে নিরস্ত করতে আমি পারিনা, আমার কথা তিনি শোনেন না। কিন্তু আপনি ও নামে ডাকলে আমি খুবই লজ্জা পাব। আপনি জানেন না, দেবী কেন দাসী সম্বোধনের যোগ্যও আমি নই।—হঠাৎ গৌরীর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। সে দ্রুতপদে, বোধহয় আত্মসংবরণ করবার জন্যই, তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

বিস্মিত সোমনাথ দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দ বনশ্রী।

কোথাও জীবনের স্পন্দন পর্যন্ত বুঝি নেই। ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলোও বোধ হয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগে শিয়াল ডেকেছিল। তার পর থেকে জীবনের অস্তিত্বের পরিচয় আর পাওয়া যায়নি।

শয্যায় প'ড়ে সোমনাথ এপাশ ওপাশ করছে। আজকের রাত্রিতে এই মুহূর্তে বনশ্রীতে সেই বুঝি একা জেগে আছে। ঘুম তার চোখে নেই। বস্তুত ট্রেণে ওঠা থেকে সুরু করে, ঘটনাচক্রের জালে সে এমনি ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে নিদ্রা তার আসছে না।

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে গৌরীর মনে সে কি কোন আঘাত দিলে?

তার আচরণের কোন অর্থই সে খুঁজে পাচ্ছে না। কাল সকালে উঠে কি ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আজকের ঘটনার গ্লানি তার মন থেকে মুছে যাবে, সেই কথাই সে বারবার ভাবছে।

তার চিন্তার বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্য গৌরীর অন্তরেই বা এত কৌতূহল কেন? সে চিন্তাচ্ছন্ন, গৌরী তা লক্ষ করেছে প্রথম থেকে, সম্ভবত বনশ্রীতে পদক্ষেপ করবার পরেই। তার সজাগ দৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। সত্যই তো, সে এখানে এসেছে বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে।

তার অশান্ত চিত্তের দাহ এমনি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে আত্মীয় স্বজন অথবা পরিবেশ কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারেনি।

সংসার তাকে একেবারে রিক্ত ক'রে দিয়েছে, আর রিক্ত হয়েই সে বনশ্রীতে এসেছে গৌরীর আশ্রয়ে। কিন্তু মনের দৈন্য কি তার মুখের চেহারায় ফুটে উঠেছিল? অদৃষ্টের বঞ্চনা তাকে শুধু বিদ্রূপে জর্জরিত ক'রেই কি ক্ষান্ত হ'ল না, ললাটে কলঙ্ক অঙ্কিত করে তার জয়চিহ্ন পরিয়ে দিয়ে গেল?

কে জানে গৌরী আরো কি জানতে পেরেছে!

হঠাৎ আকুল হয়ে ওঠে সোমনাথ।

শিপ্রাকে মনে পড়ে। ক্ষণকালের ক্ষণাশ্রিতা!

নদীর কলস্বনের মত মুখরা, নির্ঝরিনীর মত গতিশীলা শিপ্রা। তাকে পেয়ে জীবনে সে লাভ করেছিল ঐশ্বর্য, কিন্তু মাকে সুখী করতে পারেনি। শিপ্রা নিজেও সুখী হয়নি। তার মুখের দিকে চেয়ে সে তিল তিল ক'রে আত্মবিসর্জন ক'রে গেছে। কিন্তু সে আত্মবিসর্জন কি সার্থক হয়েছে? সোমনাথ তো সান্ত্বনা পায়নি। তার ভাবপ্রবণতার যূপকাষ্ঠে যে শিপ্রা বলি হ'ল, সে আজো তার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে কেন? দেহটাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে হৃদয়ের সিংহাসনে রাণী হয়ে ব'সে সেও কি আজ তাকে বিদ্রূপ করছে না?

তার জীবনের সেই বিয়োগান্ত নাটক কি ভয়ঙ্কর!

বিয়ের পর ক'টা দিনই বা সে শান্তিতে কাটিয়েছে? আবির্ভাবের প্রথম দিনটি থেকেই মা তার পুত্রবধূকে ভালো চোখে দেখেননি। সেই ভালো চোখে না দেখা কঠোর নির্যাতনে রূপান্তরিত হ'ল, যেদিন মা জানতে পারলেন ছেলে তার বধূকে ভালবাসে।

সেই চঞ্চলা তরুণীকে সোমনাথ যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। সে এসে দাঁড়ায় তার গায়ের দুধে আলতা রঙ নিয়ে, আকর্ণ বিশ্রান্ত দুই

চোখে মায়া বিস্তার করে। তার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে আলুলায়িত অজস্র চুল। অধরোষ্ঠে খেলা করে এক রহস্যময় হাসি।

সে হাসির সঙ্গে বোধ হয় মাটির পৃথিবীর কোন সম্পর্ক নেই।

শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সে ভালো বেসে ফেলেছিল তাকে। সেই ভালোবাসার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ শুধু মা কেন গোটা সংসারই জানতে পারলে।

কিছুদিন পরেই সোমনাথ দেখতে পেলে মা'র মুখের হাসি নিভে গেছে। তাঁর শান্ত ও প্রসন্ন মুখে নেমে এসেছে একটা কালো ছায়া। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারবার পরেও সে আমল দিতে চায়নি ঘটনাটাকে। ক্ষুব্ধ মনকে শুধু বুঝিয়েছে, ও একটা মেয়েলি ব্যাপার।

কিন্তু ক্রমশ এমনি অবস্থার সৃষ্টি হ'ল যে 'মনকে চোখ ঠারা' আর চলল না।

শিপ্রা একদিন তাকে বলছিল, তুমি ত গড়লে এই সংসার। এবার একে আমার হাতে ছেড়ে দাও দিকি। তোমার গড়া জিনিষকে আমি সাজিয়ে গুছিয়ে ঝরঝরে, তকৃতকে করে ফেলি।

বেশতো।—উত্তর দিয়েছিল সোমনাথ, এ সংসার তো তোমারই। তুমি একে না সাজালে আর সাজাবে কে?

সে তখন বেরোচ্ছিল। কথাটা শেষ করে ঘর থেকে বাইরে আসতেই তার চোখে পড়ল দরজার ধার থেকে মা তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

বিস্মিত হল সোমনাথ। মার চোখে মুখে এমনি একটা ভঙ্গী যাকে শুধু অস্বাভাবিকই বলা যায় না, যা দেখে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ বলে ভ্রম হয়। সে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে মা?

তার প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর মা দিতে পারলেন না।

সোমনাথেরও সহসা যেন বাক্শক্তি অবধি স্তব্ধ হয়ে গেল। তারা

দুজনে যে সব কথা বলে তা কি মা এমনি করেই আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনেন? লজ্জায় ও ঘৃণায় তার অন্তর 'ছি ছি' করে উঠল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার ঢুকল ঘরে। বাইরে বেরোন সে দিন হ'ল না।

সংসারে দারিদ্রের স্বাদ সে পুরোপুরি ভাবেই পেয়েছে। কিন্তু তার জীবনে সাংসারিক নীচতার এই প্রথম পদক্ষেপ।

শিপ্রাকেও সে কিছু বললে না। তার দিকে মুখ তুলে চাইতেও যেন তার লজ্জা করছিল। গালে হাত দিয়ে প্রসারিত বিছানার একধারে সে শুধু চুপ করে বসে রইল।

বেশীক্ষণ দেরী হ'ল না। সোমনাথ শুনতে পেলে মা'র চাপা ক্ষুব্ধ গর্জন: সংসার বউয়ের হাতে যাচ্ছে। এবার বউয়ের হাততোলা খেয়ে আমাকে দিন কাটাতে হবে। হা ভগবান, তুমি আর কতো খোয়ার আমার করবে? যম কি আমাকে ভুলে গেল?

একটা অসহ্য যন্ত্রনায় সোমনাথের বুকের ভিতর যেন মোচড় দিয়ে উঠল। একি জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় মা দিলেন? তার কথার এমনিধারা অর্থ করা হবে সেত তা জানতো না। শিপ্রা এই সংসারকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে মা'র খোয়ার হবে? যেখানে শ্রী ফুটিয়ে তোলা তার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে একি বিশ্রী পরিবেশের সৃষ্টি করলেন তিনি? বজ্রাহতের মত নিঃশব্দ হয়ে সোমনাথ কিছুক্ষণ বসে রইল।

তারপর প্রতিবাদ করবার জন্য উঠে দাঁড়াল সে।

শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল ঘরের বাইরে। বোধ হয় তার মুখের ভাব দেখে সে বুঝতে পেরেছিল সোমনাথ কি করতে চায়। ঘরের ভিতর ছুটে এসে সে তার হাত ধরে বললে, লক্ষীটি, এখন কিছু বলতে যেয়ো না। তাতে হিতে বিপরীত হবে।

—কেন?

—মা ছেলেতে মুখোমুখি একটা ঝগড়া হওয়া কি ভালো ? তুমি যা বলবে উনি তা কিছুতেই বুঝবেন না। বরং যে সমস্ত নোংরামি চাপা আছে তার সমস্তই বাইরে বেরিয়ে আসবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো।

—চুপ করে থাকলে ত এর প্রতীকার হবে না ?

—চুপ করে থাকলেই হয়তো এর প্রতীকার হবে। যে কোন কারনেই হোক মা আমাদের ভুল বুঝেছেন। একমাত্র আমাদের ব্যবহারে যদি ওঁর ভ্রম সংশোধন করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

শিপ্রার কথাটা ভাবতে লাগল সোমনাথ। মা তখনো চাপা গর্জ্জনে ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন।

শিপ্রার কথা মতই কাজ আরম্ভ হ'ল। মা'র ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা। ভস্মে ঘী ঢালার মতই সে চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হয়ে গেল। কিছুতেই কিছু হ'ল না। মা বুঝলেন না। ভুল ভাঙা দূরে থাক্, ভুলের হিমালয় যেন জমে উঠল তাঁর মনের মধ্যে।

সারা সংসার বিষাক্ত হয়ে উঠল।

যে নীচতা মা'র অন্তরে সংক্রমিত হয়েছিল তার স্পর্শ ধীরে ধীরে ছোট ভাইবোনগুলোকেও কলঙ্কিত করে তুলছিল। সোমনাথ চারদিক অন্ধকার দেখলে। একি ক্লেদাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে সে ? ভাইবোন গুলোও নষ্ট হয়ে যাবে ? এই কি তার বিয়ের পরিণাম ?

সংসার গ'ড়ে তোলার সময় সে যে স্বপ্ন দেখত, ভাই বোনদের মনের মত করে তৈরী করবে। একি হ'ল ? এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে গেল ? তার সাফল্যের গর্ব সমুদ্রের এ কোন ডোবা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে হ'ল চূর্ণবিচূর্ণ ?

মুখ কালো করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

অদৃষ্টের কাছে তার এই প্রথম পরাজয় স্বীকার।

এদিকে শিপ্রার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ হয়ে উঠল। একটা পাইথন্ যেন তার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে বজ্রবন্ধনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে আনছিল। তার মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠত অসহ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

সোমনাথ অভিভূত হয়ে পড়ল। কি করবে সে তার কিছুই ঠিক করতে পারল না। একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনাপ্রবাহ তাকে যেন সাময়িক ভাবে বিমূঢ় করে দিলে। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখত, শিপ্রা কেমন করে নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য্য তার সহ্য করবার ক্ষমতা!

মা'র এবং ভাই-বোনদের সমগ্রীভূত বিদ্বেষের একমাত্র লক্ষ শিপ্রা। সংসারে যত দোষ, ত্রুটী, অসামঞ্জস্য আছে তার সমস্ত কিছুর জন্য যেন সেই দায়ী। সত্যসত্যই সে কি এসেছিল একটা ঘূর্ণী ঝড়ের মত, সংসারটাকে ধ্বংস করে দিতে?

কি দুঃসহ নির্যাতন।

কে জানত ঈর্ষা এত জঘন্যতা সৃষ্টি করে? এত গ্লানি আর বিষাক্ত ক্লেদ তার সঞ্চয়!

সোমনাথ তার জীবনের মুহূর্তগুলো ভরিয়ে তুলত অনুতাপে আর অভিমানে। সেই মা, স্নেহময়ী মা, তার আদর্শ মা, আজ এ কি রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ? কি অপরাধ করল সন্তান যে অচ্ছেদ্য সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গেল?

ঈর্ষার স্পর্শ কি কুটীল?

মাকে বোঝানোর জন্য কোন চেষ্টাই সে বাকী রাখেনি। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে লাগল। একদিকে নিপীড়িতা শিপ্রাকে সে বিন্দু বিন্দু করে অভিষিক্ত করত তার অমৃতধারার মত প্রেমে, আর-অন্যদিকে মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য চোখ মেলে দেখত তিলে তিলে শিপ্রার

আত্মবিসর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া। মা'র ওপর কঠিন হয়ে উঠতে পারেনি সে।

হয়তো সে কাপুরুষ। কিন্তু এছাড়া আর কোন পথও ত সে দেখতে পায়নি।

সংসারে স্বচ্ছলতা ছিলনা, সেও শিপ্রার দোষ। দিনের বেলা জীবিকা উপার্জনের জন্য যখন সে বাইরে বাইরে ঘুরত, তখন শিপ্রা থাকত অনাহারে। সে কথা সোমনাথ জানতেও পারত না।

মা তো বলতেনই না। স্বামী উপার্জন করে কম, সুতরাং শাস্তি প্রাপ্য স্ত্রীর। বোধ হয় এই ছিল তাঁর বিচার। কিন্তু শিপ্রাও তো কোন কথা প্রকাশ করেনি।

পল্লীগ্রামের ঘোমটা-দেওয়া অশিক্ষিতা বধূ নয়, শিক্ষিতা সহরের মেয়ে। আত্মত্যাগের মন্ত্রে যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বিকাশদার কাছে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা হয়েছে যে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। সে এমন আচরণ করলে কেন? এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা কেউ প্রত্যাশাও করেনি।

তার জন্য সোমনাথ দায়ী নিজে। এই শোচনীয় ঘটনার সমস্ত অপরাধ তাকেই এসে স্পর্শ করে। দায়িত্ব পরিহার করবার উপায় তার নেই।

শিপ্রাকে বারংবার সে বলেছে: মার সঙ্গে মানিয়ে তোমাকে চলতেই হবে। তিনি যতো দুর্ব্যবহারই করুন না কেন, তাঁকে ছেড়ে আলাদা বাস করবার কথা চিন্তা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। বরং তোমাকে ছাড়তে পারব, কিন্তু মাকে নয়।

শিপ্রা অবশ্য কোনদিন তাকে আলাদা হওয়ার জন্য বলেনি। তার নিজেরই মনে হ'ত, একবাড়ীতে থেকে শিপ্রাকে সুখী করা আর সম্ভব নয়।

কথাগুলো সে যখন শিপ্রাকে বলত, তখন তার মুখের দিকে চেয়ে

দেখত না। আজ মর্মদাহে সে অস্থির হয়ে ওঠে অতীতের অবিচারের কথা ভেবে। মা করেছেন অত্যাচার আর সে করেছে অবিচার।

কি নিদারুণ অভিমান নিয়েই না শিপ্রা তখন স্তব্ধ হয়ে থাকত? মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত চেপে রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলত, না না, তোমার মাকে ছাড়তে হবে না।

সোমনাথের অলক্ষে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠত শিপ্রার অভিমান।

কত কথাই সে বলত, আমার জন্যই তোমার দুর্গতি। তুমি যদি বিয়ে না করতে।

আবার কখনো বলত, পাড়াগাঁ থেকে যদি একটা ঘোমটা-দেওয়া বউ আনতে, মা বোধ হয় সন্তুষ্ট হতেন।

কথাটা সত্য। মাও বলতেন, একি মেয়ে বাবা? বউ নয় ত টাট্টু ঘোড়া!

ছেলের অমত দেখে প্রথমে তিনি বিকাশের নির্বাচিত পাত্রীর সঙ্গে বিয়েতে মত দিলেও পরে স্বাতন্ত্রপ্রিয়া পুত্রবধূকে দেখে হতাশ হয়েছিলেন। শিপ্রা কিন্তু সত্যসত্যই স্বাতন্ত্রপ্রিয়া ছিল না। অবশ্য স্বকীয় বৈশিষ্ট তার ছিল, আর সেই বৈশিষ্টই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পরম শত্রু।

তার মনে পড়ে মা প্রায়ই বলতেন, ওঃ, কি নিশ্বাস? নিশ্বাসে আমার ছেলের রসকষ সব শুষে নিলে? ছেলে আমার কাঠ হয়ে গেছে!

ছেলের আকৃতি কাঠ হয়ে যাওয়ার কারণ যে তিনি নিজেই, ঈর্ষায় আচ্ছন্ন হয়ে সেকথা তিনি অনুভব করতে পারতেন না।

শিপ্রা নিজের প্রতি নির্যাতন স্তব্ধ হয়েই সহ্য করত। কিন্তু সোমনাথের প্রতি অসদ্ব্যবহার দেখে চুপ করে থাকতে পারত না।

মার সঙ্গে যেদিন থেকে সোমনাথের কথা বন্ধ হয়ে গেল, যেদিন মায়ের পরামর্শে ছোট ভাই-বোনেরা তাকে করলে অপমান, সেদিন

শিপ্রা বলেছিল, এর চেয়ে আমাকে বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিন না মা ?

মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, তাড়িয়ে দিলে তুমি কি আর যাবে মা, আমার ছেলে আর সংসারকে চিবিয়ে খেয়ে তবে তুমি বিদায় হবে।

সোমনাথের মনে পড়ে সেদিন শিপ্রার চোখের জল বাধা মানেনি। এত কান্না কাঁদতে তাকে আর কখনো সে দেখেনি। সে তাকে সবল বলেই জানত। এক কথায় চোখের জল ফেলে কাঁদতে কখনো বসতো না শিপ্রা। প্রতিবাদ না করলেও হাসিমুখে নির্যাতন সহ্য করবার শক্তি তার ছিল।

ওই একদিনের ধৈর্যচ্যুতিই সোমনাথ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। সেদিন তার ভিতরকার পৌরুষ ক্রোধে ও ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে উঠে অন্তরে সৃষ্টি করেছিল দুর্নিবার আলোড়ন। সেদিন সেও ক্রোধে অন্ধ হয়ে বলেছিল, আর নয়, এবাড়ী থেকে চল শিপ্রা।

—আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, তারপর একেবারেই যাব।—কাঁদতে কাঁদতে শিপ্রা বলেছিল।

পুঞ্জীভূত অভিমান নিয়ে সেদিন সে ব'সে শুধু কেঁদেছিল। বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার জন্য সোমনাথের অনুনয়, অনুরোধ, কিছুই গ্রাহ্য করেনি।

কিন্তু কি আশ্চর্য প্রতিশোধ সে নিলে সোমনাথের ওপর !

মাত্র কয়েকদিনের টাইফয়েড জ্বরে মারা যায় শিপ্রা।

"বরং তোমাকে ছাড়তে পারব কিন্তু মাকে নয়" একথা যাকে সোমনাথ বলেছিল, সে মৃত্যুর আগের দিনে বললে, এবার আমি তো যাচ্ছি। মাকে নিয়ে সুখী হওয়ার চেষ্টা করো। তোমার কথা আমি রেখেছি। আমার জন্য তোমাকে মা ছাড়তে হয়নি।

তার পাণ্ডুর মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতা, কিন্তু নিষ্প্রভ চোখ দুটি সজল।

সোমনাথের চোখও সজল হয়ে উঠেছিল। শিপ্রার ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করে সে বলেছিল, কোথায় যাবে তুমি শিপ্রা? পাগলামি করতে আছে কি? ছিঃ! তুমি সেরে ওঠো। এবার আমি একটা ব্যবস্থা করবই।

—আর হয় না। উত্তর দিলে শিপ্রা। ক্ষীণ ও কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, প্রথমে বিকাশদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম নির্বিচারে তোমার আদেশ পালন করব, পরে তোমাকে ভালোবেসে তোমার আদেশ পালন ক'রে সুখই পেয়েছি। কোন অত্যাচার বা নির্যাতন আমার গায়ে কাঁটা হয়ে ফোটেনি। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে আমাকে রক্ষা করেছে তোমার ভালোবাসার বর্ম। সেই বর্মের দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে মৃত্যুযন্ত্রণাও আমার জন্যে নিয়ে এসেছে ফুলের স্পর্শ। আমি যাই।

আর কথা কয়নি সে। পুরো চব্বিশঘণ্টা একেবারে নিঃশব্দ হয়েছিল। সেই স্তব্ধতার মাঝখানেই এক সময় তার শেষ নিঃশ্বাস অন্তহীন নৈঃশব্দের বুকে মিলিয়ে গেল। ক্ষণ-কালের ক্ষণ-নির্ঝর!

সোমনাথও হাহাকার করেনি।

পাথরের মত বসেছিল সে।

কিন্তু আশ্চর্য প্রতিশোধ নিয়েছে শিপ্রা। সে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে মাকেও ছেড়েছে সোমনাথ। শ্মশান থেকে আর বাড়ী ফেরেনি। সিক্ত বস্ত্রে এসে উঠেছিল বিকাশের কাছে। সপ্তাহ তিনেক তার কাছে থেকে, এসেছে বনশ্রীতে।

—ঘুমোচ্ছেন সোমনাথবাবু?—গৌরীর কণ্ঠস্বর।

ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসল সোমনাথ, না, ঘুমুইনি তো।

উঠে দরজা খুলে দিলে সে। গৌরী ভিতরে প্রবেশ করতে করতে বললে, আচ্ছা রাত জাগতে পারেনতো? শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিলেন বুঝি? কিন্তু আর চিন্তা করবার অবসরও বোধ হয় পেলেন না। পুলিশ এসেছে।

গৌরীর কণ্ঠ পরিহাস-তরল। বিস্মিত হল সোমনাথ। এ কোন দুঃসাহসিকার সংস্রবে সে এসে পড়ল? ভয় সে না পেতে পারে, কিন্তু আকস্মিকতার একটা গুরুত্ব আছে তো? সে কি তাও গ্রাহ্য করবে না?

মিঃ ধাড়া এসেছেন। সঙ্গে পুলিশবাহিনী।

বাড়ী সার্চ হ'ল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। রান্নাঘরের হাঁড়ি-কুড়ি থেকে সুরু করে বিছানার লেপ, তোষক, বালিশ পর্যন্ত কেটে দেখা হল। কিছু পাওয়া গেল না।

শেষে পণ্ডিতের কয়েকখানা পুঁথি হাতে করে বসলেন মিঃ ধাড়া। বইগুলো উল্‌টে পাল্‌টে কয়েকবার দেখে বললেন, আমিত এসব কিছু বুঝি না। সেন, তোমার কিছু পড়া আছে নাকি? তুমি বি-এ পাশ করেছিলে না?

—করেছিলুম স্যর।—এগিয়ে এল সেন।

—দেখ দিকি, বইগুলো সম্বন্ধে যদি তোমার কিছু জানাশোনা থাকে? শুনেছি প্রাচীন ভারতে সাম্যবাদের সমর্থনে অনেক কথা বলা হয়েছে। তার কিছু হদিস্ যদি এইসব বই থেকে পাওয়া যায়।

বইগুলো সেনও উল্টে পাল্‌টে দেখলে। বললে, এখানা বৃহদারণ্যক উপনিষদ, এখানা ছান্দোগ্য, তারপর দেখছি কাদম্বরী, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, চণ্ডী···না স্যর, আর যাই থাক এসব বইয়ের মধ্যে সাম্যবাদের ইঙ্গিত নেই।

—নেইত? যাক্‌ নিশ্চিন্ত হলুম। মিঃ ধাড়া বললেন, একে ত একশ চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য ক'রে এঁরা অপরাধ করেছেন। তার ওপর যদি এঁদের সাম্যবাদী ব'লে সন্দেহ করা যায়, তাহলে সোনায় সোহাগা হবে কিনা। অপ্রিয় কর্তব্য করতে এসেছি। তবু যতটা সম্ভব এঁদের কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করাই ত আমার উচিত? আমিও ত একজন ভদ্রলোক?

—সে ত নিশ্চয়ই স্যর।—সেন বললে।

—কত কষ্ট মানুষকে দোব বল? ঘুমুচ্ছিলেন এঁরা। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে বাড়ী সার্চ করতে হ'ল। ডিউটি এমনি কঠিন জিনিষ!

—সে ত বটেই স্যর।—সেন আবার বললে।

এবার মিঃ ধাড়া গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বললেন, কিন্তু একটা জিনিষ বড়ো আশ্চর্য লাগল। অবশ্য বিপ্লবীরা চিরদিনই আদর্শ চরিত্র, তাহলেও দেখতে যেন কেমন লাগে নাকি? পণ্ডিতমশাই বাড়ীতে নেই, অথচ এক জায়গাতেই রাত্রি যাপন করছে নিঃসম্পর্ক দুটি তরুণ-তরুণী। 'দুজনে একলা' যাকে বলে আর কি, যেন কি রকম মনে হচ্ছে না? লোকনিন্দা বলেওতো একটা জিনিষ আছে?—একবার কাসলেন মিঃ ধাড়া।

সেন হাসলে। বিশ্রী কদর্য হাসি।

সোমনাথ দাওয়ার ওপরে একবার নড়ে চড়ে বসল। গৌরী কাছেই বসে ছিল, কিন্তু অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না। তবে সে যে স্থির হয়েআছে, সেটুকু অনায়াসেই বোঝা যাচ্ছিল।

—কি মিঃ চাটার্জি, আমি কিছু অন্যায় বলছি না ত? দেখবেন, আপনি আমার পরিচিত লোক। কলকাতায় ইলিসিয়ম্‌ রোতে অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে।—মিঃ ধাড়া বললেন।

—পুলিসের ন্যায়-অন্যায় বোধ বলে কোন জিনিষ আছে নাকি ?—উত্তর দিলে সোমনাথ।

—এইত। আপনি রাগ করলেন।

—কে বললে? আপনার কথায় রাগ করব?

—কেন? আমাদের মত লোককে কি মানুষ বলেই গণ্য করেন না নাকি?

—না।

সোমনাথ আর কিছু বললে না। মিঃ ধাড়াও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এর পর আধ ঘণ্টা ধরে মিঃ ধাড়া রিপোর্টের জন্য তাঁর সংগৃহীত তথ্য লিপিবদ্ধ করলেন। তারপর উঠে বললেন, আমার বিশ্বাস আমি একজন ভদ্রলোক। সেই জন্যে আপনাদের কাছে অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনাদের সাহায্য করবারই চেষ্টা করছি। আপনাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকলেও পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করা অনেক কিছু আমার কাছে আছে। সেগুলির সুযোগ নিয়ে বহু অসুবিধার মধ্যেই আপনাদের টেনে নিয়ে যেতে পারতুম। কিন্তু তা না করে আমি আপনাদের একটা সুযোগ দিতে চাই।

সে নিজেকে ভদ্রলোক বলে প্রমাণ করবার জন্যে? সোমনাথ বললে।

তার মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ না করে ধাড়া বললেন, একশচুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করবার জন্যে গ্রেপ্তার না ক'রে আমি আপনাদের সাবধানই ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি, এই ওয়ার্ণিং আপনারা যথাযথ ভাবেই নেবেন। সার্চ ক'রে আমি কিছু পাইনি, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠে না। তবে আমার অনুরোধ, আমার দেওয়া সুযোগ আপনারা গ্রহণ করতে চেষ্টা করুন। আপনাদের দুজনেরই প্রতিভা আছে, আছে শক্তি।

এই প্রতিভা ও শক্তি চাষা ক্ষেপানোর কাজে অপব্যবহার না করে

সত্যিকারের কাজে লাগান। তাতে শুধু আপনাদের নয়, দেশেরও মঙ্গল হবে।

—হাততালি দিতে ইচ্ছা হচ্ছে মিঃ ধাড়া।—সোমনাথ হেসে উঠল,—পুলিসের মুখে দেশের মঙ্গলের কথা? এ যে ভূতের মুখে রামনাম? না এবার বিশ্বাস করতে হ'ল যে দেশ সত্যিই স্বাধীন হয়েছে।

নীরস কণ্ঠে ধাড়া বললেন, আজ যত পারেন বলুন মিঃ চটার্জি, আমি কোন কথাই গায়ে মাখব না। আমি আজ আপনাদের সুযোগ দিতেই এসেছি। যদি সে সুযোগ না নেন্, তাহলে আপনার প্রত্যেক কথারই জবাব অদূর ভবিষ্যতে পাবেন। তবে আমি ন্যায়-সঙ্গত ভাবেই আশা করব যে, আমার কথা আপনারা ভেবে দেখবেন।

উঠে দাঁড়ালেন ধাড়া, নমস্কার। নমস্কার গৌরীদেবী। বিরক্ত করবার জন্য ক্ষমা করবেন। আর চিন্তা ক'রে দেখবেন আমার কথাগুলো। যদি আমার প্রস্তাব আপনাদের কাছে যুক্তিযুক্ত ব'লে বিবেচিত হয়, তাহলে হয়ত বহু ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারব।

মশ মশ করে ধাড়া চললেন পুলিশবাহিনী সঙ্গে নিয়ে।

সোমনাথ উচ্চ কণ্ঠেই বললে, ভেবে দেখবার কোন দরকার নেই। আমাদের উত্তর আপনি এখনি নিয়ে যান্। পুলিসের ফাঁদে আমরা পা দোব না।

ধাড়া বোধ হয় তার কথায় কান দিলেন না।

স্বরূপনগরের জমিদার বাড়া।

ইন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী একাকী বসেছিলেন তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে। ঘরখানি তাঁর গোপন পরামর্শের স্থান। বহু অব্যক্ত পাপের ইতিহাস এই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে অদৃশ্য ভাষায় লেখা আছে। অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া এই ঘরে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই।

খাস ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে, ধাড়া এসেছেন।

তাঁর ইঙ্গিতে সে ধাড়াকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

হুইস্কির বোতল সামনে খোলাই ছিল। ধাড়া প্রবেশ করতে রায়চৌধুরী নিজেই এক পেগ তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।

এক নিঃশ্বাসে সেটুকু গলাধঃকরণ ক'রে ধাড়া বললেন, শয়তানীতে কেউ কম যায় না।

—কার কথা বলছেন? পণ্ডিত আর সেই মেয়েটা?—প্রশ্ন করলেন রায়চৌধুরী।

—পণ্ডিতের দেখা পাইনি। সংবাদ পেয়েছি, রাত্রের গাড়ীতেই সে কলকাতা গেছে। আমি বলছি, ওই মেয়েটা আর সেই ছোঁড়াটার কথা।

—কোন ছোঁড়াটা ?

—বলেছি ত, কলকাতা থেকে একজন বিপ্লবী এসে ওদের দলে যোগ দিয়েছে।

—ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।—এক পেগ খেলেন রায়চৌধুরী।

ধাড়াও এক পেগ ঢাললেন।

—যাক্, আপনি কি করলেন বলুন ?

—প্রকৃতপক্ষে করিনি কিছুই।—ধাড়া বললেন, পণ্ডিতের বাড়ী সার্চ ক'রেছি আর ওদের ওয়ার্নিং দিয়ে এসেছি। প্রকারান্তরে একথাও বলতে পারেন, ভবিষ্যতে অনেক কিছু করবার জমি তৈরী করে এসেছি।

—আপনি অত্যন্ত আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন মিঃ ধাড়া।

—আস্তে এগোনই ত ভাল।—ধাড়া হাসলেন।

—আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।—রায়চৌধুরী বললেন, শুনলুম বহু লোক ওদের সভায় জমায়েৎ হয়েছিল। আমি ত জানি, আমার প্রজারা শুধু নিরীহ নয়, ভীরুও। ওরা একসঙ্গে জমিদার আর পুলিশকে অবজ্ঞা করবার সাহস পেলে কোথা থেকে ?

—কোথা থেকে পেয়েছে সে ত আমরা জানি মিঃ রায়চৌধুরী।

—জানি যখন, তখন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেরী করছি কেন ? আপনি জানেন না, আমার এই সব প্রজারা আগে আদালতের নামে মূর্চ্ছা যেত। জমিদারের কাছারিতে আসত বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে। দেখবেন, ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেরী করে শেষটা সমস্ত ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়।

—কিছুতেই না।—দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ধাড়া, আপনার এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন। তবে আপনাকেও এবার কাজে নামতে হবে, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি।

—কি বলুন ?—রায়চৌধুরী বললেন, আমার কাজ ধরো আর

মারো। আপনার মত অত ঘোরপ্যাঁচ আর হুসিয়ার হয়ে চলা আমার দ্বারা হবে না। আমি যেদিন নামব, সেদিন গ্রামকে গ্রাম সাফ্ হয়ে যাবে। লাঠির চোটে বাবা বলাতে একদিনের বেশী দেরী আমার হবে না।

গম্ভীর কণ্ঠে ধাড়া বললেন, আমার গভর্ণমেণ্টের হুকুম অন্য রকম মিঃ রায়চৌধুরী। অনর্থক অশান্তি সৃষ্টি আর প্রজাপীড়ন তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। যে যাই বলুক, আমাদের সরকারের নীতি এই। জেনে রাখবেন, জমিদারদেরও তাঁরা সুনজরে দেখেন না। তাঁরা জানেন, প্রজাদের অসন্তোষের জন্যে জমিদার অনেকাংশে দায়ী। বুঝতেই পারছেন, আমাকে দুদিক রেখে অগ্রসর হ'তে হবে। নাহলে একূল ওকূল দুকূলই যাবে।

—সে আমি জানি। কিন্তু দুকূল বজায় রেখে কাজ হাঁসিল কতটা হবে সেই কথাই আমি ভাবছি।—রায়চৌধুরী বললেন।

—কাজ হাঁসিল সম্পূর্ণই হবে, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব গভীর না হলে একাজে হাত আমি দিতুম না। কিন্তু কাজে যখন নেমেছি তখন জল ঘোলা করব না, একথা আপনাকে আমি আগে থাকতেই দিয়ে দিচ্ছি।

—সে বিশ্বাস না থাকলে আপনার সাহায্য চাইব কেন?—বললেন রায়চৌধুরী।

ধাড়া আর এক পেগ টানলেন। মনে হ'ল তাঁর নেশা একটু জমেছে। রুমালে মুখ মুছে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি মৃদুস্বরে বললেন, শুনুন, সার্চ করতে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়েছে আজ। আমি খুব অপমানিত হয়েছি।

—কার কাছে?—উত্তেজিতকণ্ঠে বললেন রায়চৌধুরী।

—দুজনেরই কাছে। তবে অপমান যা কিছু করেছে ছোঁড়াটা।

মেয়েটা শুধু ব'সে ব'সে হেসেছে। কিন্তু সেই হাসি সহ্য করাও কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। এর প্রতিবিধান একটা করতেই হবে।

—নিশ্চয়ই।

—আমি কাঁচা ছেলে নয় মিঃ রায়চৌধুরী—ধাড়া বললেন, আমি জানি যে আপনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, কিন্তু একটা সুযোগ আপনাকে দিতে হবেতো ? আমি সেই সুযোগই খুঁজছিলুম। এইবার হাতের কাছে তা পেয়েছি।

—কি রকম ?—উৎসাহিত হয়ে উঠলেন রায়চৌধুরী। তাঁর নেশাও তখন বেশ জমে এসেছে।

—ওরা সভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে, বাঁধ ওরা তৈরী করবেই। ধাত্রীর তীরবর্তী পনেরোখানা গ্রাম একসঙ্গে এই কাজ সুরু করবে। আগামী বন্যাকে প্রতিরোধ করতে ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রায় প্রতিবছর বানের জল ওই গ্রামগুলোতে ঢোকে। ফসল যায়, গোরু-ছাগল যায়, ঘর বাড়ী মানুষও যায়। সুতরাং ওদের প্রস্তাবকে মোটামুটি ন্যায়সঙ্গত বলা চলে। যদিও ওই প্রস্তাবের পিছনেই গভীর একটা উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

—কি উদ্দেশ্য ?

—পনেরোখানা গ্রামের কৃষককে জমিদারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করা আর সেখানকার মাটিতে সাম্যবাদের বীজ বপন করা।

—হুঁ।—একটা হুঙ্কার দিলেন রায়চৌধুরী।

—আমার সব কথা আগে মন দিয়ে শুনুন।—ধাড়া বললেন, ওদের কিছুতেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে দেওয়া চলবে না। তাতে আপনার স্বার্থ ত বটেই, আমার সরকারের স্বার্থও বিপন্ন হবে। যে কোন মূল্যে সাম্যবাদের প্রসারের আমরা রোধ করব।

—তাতে আমারও দ্বিমত নেই।—রায়চৌধুরী বললেন।

—সে ত বটেই।—কিন্তু কি ক'রে ওদের বাধা দেবেন? একটা নিরীহ ও নির্দোষ প্রস্তাবকে রূপ দেওয়ার কাজে যখন ওরা নামবে, তখন ওদের বিরুদ্ধে আপনি বা আমরা দাঁড়াব কোন যুক্তিতে?—সিগারেটে শেষ টান দিলেন ধাড়া।

যুক্তির ধার ধারেন না রায়চৌধুরী। তিনি বললেন, এত ভাবলে কোন কাজই করা চলে না।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন ধাড়া। বললেন, চলে। এত ভেবেই কাজ করতে হয়। আপনাদের আগেকার যুগ আর নেই। যাই হোক, ভেবে একটা পথ আমি ঠিক করেছি। এই পথেই আপনাকে চলতে হবে।

উৎসুক রায়চৌধুরী আর এক পেগ ঢাললেন।

বলতে লাগলেন ধাড়া, গ্রামের যেখানে ওরা বাঁধ দেয় দিক, কিন্তু আপনার খাসদখলে যে বিস্তৃত বন আছে, সেখানে ওদের প্রবেশ করবার অধিকার দেওয়া হবে না। আর নিষেধ সত্ত্বেও যদি ওরা প্রবেশ করে, তাহলে পাইক আর লেঠেল দিয়ে আপনাকে ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে। আশা করি এ সুযোগ গ্রহণ করতে আপনি দ্বিধা করবেন না।

—কিছুতেই না।—হাসলেন রায়চৌধুরী, মতলবটি করেছেন ত খাসা? বনের এদিকেও গ্রাম আর ওদিকেও গ্রাম। বাঁধ দিতে গেলে বন বাদ দিলে চলবে না। বাঃ! বাঃ! বেশ, মিঃ ধাড়া! বনে ওদের ঢুকতেই হবে। আর ওইখানেই আমি ওদের শিক্ষা দোব।

ধাড়াও হাসতে লাগলেন আত্মপ্রসাদের হাসি।

কিন্তু রায়চৌধুরীর অন্তরে আরো কি একটা অভিপ্রায় যেন প্রচ্ছন্ন ছিল। এতক্ষণ পরে সেটা স্পষ্ট হ'ল। বললেন, দেবী ব'লে মেয়েটা দেখতে কেমন? বয়স তো শুনি কাঁচা?

তির্যকভঙ্গীতে তাঁর দিকে চেয়ে ধাড়া বললেন, ধীরে, ধীরে, মিঃ রায়চৌধুরী। আস্তে আস্তে সমস্ত সুযোগই আপনার হাতের মুঠোয় আসবে। এখন আপনি আপনার মনোযোগ সীমাবদ্ধ করুন ওই বনে। ওইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের একটি বৃহৎ কাজ শেষ করতে হবে। আর ওই জায়গা ছাড়া আমাদের দাঁড়াবার স্থানও নেই। আমার কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া মাত্র আপনার পাইকরা যেন সেখানে গিয়ে হাজির হয়, এমনি ভাবেই প্রস্তুত থাকবেন। মনে রাখবেন, প্রথমে পুলিশ আপনাকে কোন সাহায্যই করবে না। সুচারুরূপে বাধা যদি ওদের দিতে পারেন তো সমস্ত উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আমি কি ভাবে রঙ্গভূমিতে অবতরণ করব, তাও নির্ভর করছে আপনার ওই কাজটির ওপর।

—কোন চিন্তা নেই আপনার।—জড়িত কণ্ঠে রায়চৌধুরী বললেন, আমার কাজ আমি ঠিকই করব। কিন্তু বললেন না তো, দেবীকে কেমন দেখতে ?

—দেখতে ভালো। কিন্তু সহ্য করা কঠিন। তাকে আস্তে আস্তে ধাতস্থ করে আনতে হবে।—উঠলেন ধাড়া।

—আপনার সব কাজই আস্তে।—আরো এক পেগ ঢাললেন রায়চৌধুরী।

কতক্ষণ কে জানে সেই দাওয়ার ওপরে স্থির হয়ে বসেছিল সোমনাথ। শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছিল শন্ শন্ ক'রে। বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে বোধ হয় সে একবার আগাগোড়া ভেবে দেখছিল বনশ্রীর উদ্দেশে তার যাত্রা সুরু হওয়া থেকে ঘটনাগুলোর কথা।

নাটকের দৃশ্যের পটপরিবর্তনের মত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের স্থান অধিকার করেছে সে। এর পর কি হবে? সঙ্ঘর্ষ যে অবশ্যম্ভাবী সে সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহই রইল না।

কি বিচিত্র ঘটনাচক্র! কোথায় ছিল সে, আর কিভাবে কোথায় এসে পড়ল? কোথায় শিপ্রার সঙ্গে বিচ্ছেদের সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি, আর কোথায় এক আশ্চর্য নায়িকার নেতৃত্বে গ্রাম সংগঠনের উদ্যোগ। যে উদ্যোগের মূলেই প্রবল বাধা। স্বয়ং জমিদার এবং সর্বশক্তিমান পুলিশ সংগঠনের মূলদেশে কঠিন আঘাত করতে উদ্যত।

আজ পুলিশ তাদের ছেড়ে দিয়ে গেল বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে। সে কথা সোমনাথের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু তাদের পরবর্তী কার্যক্রমে তারা যে প্রত্যক্ষ বাধারূপেই এসে উপস্থিত

হবে সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ নেই। আর সেই বাধাকে গ্রাহ্য ক'রে সঙ্ঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাও সে দেখতে পাচ্ছে না। সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানকে তার স্বধর্ম পালন করতেই হবে।

আর সময় নষ্ট করবে না সোমনাথ। বিকাশের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। কঠিনতম দমননীতির ক্ষেত্র যেখানে প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে সেও রোপণ করুক কৃষকবিদ্রোহের বীজ। ভারতবর্ষের চাষী চঞ্চল হয়ে না উঠলে সত্যকারের কোন কাজই হবে না। যতক্ষণ না স্বাধিকার অর্জনের জন্য তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ বঞ্চনার শেষ নেই। শোষণের কদর্য ইতিহাসের জঘন্য কাহিনী কলেবর বৃদ্ধি ক'রেই চলবে।

সীমাবদ্ধভাবে এখানে ওখানে, এজেলায়-ওজেলায় কৃষকরা সচেতন হোক। বিক্ষোভ আর দমননীতি তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিক বর্তমানের সমস্যা-কণ্টকিত জীবনধারার জটীল গতিপথের দিকে। তারপর ভবিষ্যত তারা নিজেরাই রচনা করবে। দশ-পনেরোখানা সুসংগঠিত গ্রাম ভবিষ্যতে একদিন আটচল্লিশ লক্ষ গ্রামকে সংগঠিত হওয়ার প্রেরণা সঞ্চার করবে না, একথা কে বললে।

—ব'সে ব'সেই কি এক ঘুম দিচ্ছেন ?

গৌরীর কণ্ঠস্বরে চেয়ে দেখলে সোমনাথ। হেসে বললে, এতবড়ো অপবাদ আমার প্রবল শত্রুও আমাকে দিতে পারবে না। বনশ্রীর মাটিতে পা দেওয়ার আগেই আমি ঘুম ত্যাগ করেছি ব'লে মনে হচ্ছে।

—আমিও তো তাই জানতুম। কিন্তু যে ভাবে স্থির হয়ে বসে আছেন সেইভাবে থাকা হয় ঘুমে না হয় নির্বিকল্প সমাধিতেই সম্ভব। তবে শেষেরটার সঙ্গে আপনার পরিচয় নাও থাকতে পারে। তাই ভেবেছিলুম বসে বসেই ঘুমিয়ে নিচ্ছেন।

—না, চিন্তা করছিলুম।—সোমনাথ বললে।

হ্যাঁ। ওই কাজটায় আপনি বিশেষ পারদর্শী। কথাটা মনে ছিল

না। তবে এমন তন্ময় হয়ে চিন্তা করাকে ঘুম ব'লে ভ্রম ক'রে আমি বিশেষ কিছু অপরাধ করিনি।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা মিটমিট করে জ্বলছিল। গৌরী সেটা নিভিয়ে দিলে। আকাশের পূর্বপ্রান্ত আরক্ত হয়ে উঠছে। একসঙ্গে বহু পাখীর কাকলী শোনা যাচ্ছে। কয়েকটা কাকও ডেকে উঠল।

গৌরী বললে, এখন আমাকে যদি একটু সাহায্য করেন তো ভালো হয়। বাড়ীতে যত লেপ-কাঁথা-বালিশ ছিল, সবই কেটে-কেটে তো পুলিশ সার্চ করে গেল। হাওয়ায় উড়ে-উড়ে গোটা বাড়ীখানা তুলোয় ভরে গেছে। গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিষপত্র উঠানে জড়ো করা। এক রাত্রিতেই সব তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেছে। এগুলোকে যথাস্থানে রেখে বাড়ীটা একটু পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করতে হবে তো?

লজ্জিত হয়ে সোমনাথ বললে, চলুন, এখনি ক'রে ফেলি। কথাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

—ভাগ্যিস ভাবেননি!—হাসলে গৌরী, যে চিন্তাশীল আপনি তাতে এই নিয়ে আবার ভাবতে বসলে কতক্ষণ কাটিয়ে দিতেন কি জানি। মাঝখান থেকে হ'ত এই যে কাজ কিছুই হ'ত না।

গৌরীর কথার খোঁচা নিঃশব্দেই পরিপাক করলে সোমনাথ।

দুজনে মিলে লেগে গেল বাড়ী পরিষ্কার করতে। গৌরী বাঁধল গাছ-কোমর আর সোমনাথ কাপড় পরলে মালকোঁচা করে। প্রায় ঘণ্টা দুই পরিশ্রম ক'রে তারা বাড়ীটার শ্রী ফিরিয়ে আনলে।

—না। ভুল করেছিলুম। চিন্তাই শুধু করেন না, কাজ করতেও জানেন।

—কি জানি, আমার ত মনে হয় চিন্তাই শুধু করতে জানি। কাজ যেটুকু করেছি সে হয়তো আপনার সঙ্গের গুণে।

—আমার সঙ্গের গুণে কাজ হয় না, অকাজ হয়।—গৌরী বললে।

—তাহলে তাই এতক্ষণ করলুম।—উত্তর দিলে সোমনাথ।

গৌরীকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। তার বিশাল চোখ দুটি যেন ভাষাময়। ললাটে জমে উঠেছে স্বেদবিন্দু। গাছকোমর বাঁধা আঁটোসাটো দেহে যৌবনের লীলাভঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠছে। তার সম্মুখেই শুধুগায়ে মালকোঁচা বাঁধা সোমনাথ। তারও পেশীপুষ্ট সবল দেহ ঘর্মধারায় অভিষিক্ত। গত কয়েকদিনের অবসরের অভাবে দাড়ী কামানো হয় নি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর একমুখ গোঁফ-দাড়ীতে তাকেও কিন্তু মন্দ দেখাচ্ছে না।

মুখোমুখি যেন দাঁড়িয়ে আছে আদিম মানব ও মানবী।

দুজনের চোখেই রাত্রি জাগরণের কালিমা, মুখে বিবর্ণতা। পুলিশের অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদে দুজনের চোখেই একটা অনমনীয় কাঠিন্য আর দৃঢ়সংকল্পের দুর্জয় আভাস।

এই মুহূর্তে এদের দুজনকে দেখলে বিক্ষুব্ধ বনশ্রীকে চিনে নিতে বিলম্ব হয় না।

—যাক্, এদিক একরকম সারা হ'ল। এখন আমাদের আসল কাজের কি হবে বলুন তো? গৌরী বললে একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

—আসল কাজ এবার সুরু হবে।—সোমনাথ উত্তর দিলে।

—ভেবেছিলুম, ভোরে দুটো চালে-ডালে ফুটিয়ে নিয়ে আপনাকে সঙ্গে করে বেরোবো। বাঁধের কাজের আয়োজন আজ থেকে আরম্ভ হবে, এই প্রতিশ্রুতিই জনসাধারণকে আমরা দিয়েছি। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াল তাতে আহারের আশা করা একরকম দুরাশা বলেই মনে হচ্ছে।

সোমনাথ বললে, আহার আজ থাক। গ্রামগুলো বেড়িয়ে নেওয়ার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। চলুন, এখনি যাত্রার ব্যবস্থা করা যাক্।

—তাতে আপত্তি আমারও নেই। তবে আপনার মত আহার-

নিদ্রা জয় ক'রে উঠতে পারিনি বলেই ভাবছি। কিন্তু রান্না করতে গেলে বেলা আরো বেড়ে যাবে না ?

—তা তো যাবেই। বেলা আমাদের অপেক্ষায় থাকবে না গৌরী…। —দেবী কথাটা সোমনাথের মুখে এসেও আটকে গেল।

পরিপূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে গৌরী বললে, ব্যস। ওই গৌরী পর্যন্তই। দেবী আর কিছুতেই নয়। মনে থাকে যেন।

গাম্ভীর্যের অন্তরালে তার মুখে দুষ্টামিভরা হাসির আভাসও যেন সোমনাথ দেখতে পেলে।

কিন্তু আর কোন কথা বলবার অবসর তাদের কেউ পেলে না। শশী এসে উপস্থিত হল।

—কি সংবাদ শশী ?—গৌরী বললে।

শশী হাঁফাচ্ছিল। বললে, শুনলুম নাকি পুলিশ এসেছিল ?

—হ্যাঁ, এসেছিল। তল্লাসীও করে গেছে।—কথা বললে সোমনাথ।

—শুধু তল্লাসী করেনি শশী, জিনিষপত্র একেবারে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে। বিছানা-বালিশ বলতে বাড়ীতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই। হাঁড়িকুড়ির যা অবস্থা তাতে পণ্ডিতদাদা আর ওসব জিনিষে খাবেন না। অবশ্য সে সমস্যার সমাধান করা এমন কিছু নয়, কিন্তু স্কুলবাড়ীতে ইনি আজ থেকে শোবেন। এঁর শোওয়ার কি ব্যবস্থা হবে তা তো বুঝতে পারছি না।—এতক্ষণ পরে গৌরীর চোখ দুটো যেন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠল।

সেই শান্ত অথচ বিবর্ণ চোখের দিকে চেয়ে দেখলে সোমনাথ। নারীর শাশ্বত রূপ এই মুহূর্তে ওই দুই চোখের বিশাল আঁখিপল্লবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সংসারে যে মহিমায় সে প্রতিষ্ঠিতা সেই মহিমার মূলে লেগেছে আঘাত। এই কাতরতাকেই সোমনাথ বুঝি খুঁজছিল।

পুরুষের তত্ত্বাবধান, তার আদর ও যত্ন, প্রয়োজন, সর্বদিকেই

সজাগদৃষ্টি মেলে আছে নারী। সংসারে তার চিরন্তন কর্তৃত্ব। সেই কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হ'লে তাদের চোখে বেদনা বুঝি এই ভাবেই রূপ নেয়। আহত অভিমানবোধ রুদ্ধ ক্ষোভে গর্জন করে ওঠে।

শশী বললে, কিছুই আটকাবে না দেবী। ওই সামান্য কথাটা নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন? আমি ভাবছি, পুলিশ তাহলে তল্লাসী করতে আসেনি, এসেছিল প্রতিশোধ নিতে?

—তাই কি?—গৌরী বললে, এ প্রতিশোধ তো আমাদের ওপর নেওয়া হল না, এক গরীব অসহায় ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করা হ'ল।

—ব্রাহ্মণ গরীব হতে পারেন কিন্তু অসহায় নয়।—শশী বললে, পণ্ডিতদাদার সর্বস্ব গেছে আমাদের জন্য। সুতরাং বিছানা-বালিশ আর হাঁড়িকুড়ি গেলে তিনি যে বিশেষ চিন্তিত হবেন তা মনে হয় না। সর্বস্ব খুইয়েছেন বলেই তো আজ আশেপাশের পনেরোখানা গ্রামের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছেন তিনি। তিনি ছিলেন বলেই আমরা আজ চিন্তা করতে পারি। যে ভাষায় আমরা কথা বলি সেই ভাষারও শিক্ষা-গুরু পণ্ডিতদাদা। তিনি ছিলেন বলেই আমরা আপনাকে পেয়েছি দেবী। পুলিশ যদি তাঁর ওপরেই প্রতিশোধ নেয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

—তা বটে।—অনেকটা আত্মগতভাবে গৌরী কথাটা বললে।

শশী বললে, পুলিশ অবশ্য তাঁকেই শুধু জব্দ করতে আসেনি, এসেছিল সকলকেই ভয় দেখাতে। কিন্তু এত বড়ো ভুল তারা করলে কি করে, আমি সেই কথাই ভাবছি। আপনার পরিচয় কি তারা এখনো পায়নি?

—আমার স্বরূপ তোমরা যতোখানি বড়ো করে দেখো, কি করে আশা কর যে তারাও ঠিক সেইভাবে দেখবে?—গৌরী বললে।

—বড়ো করে তো দেখি না দেবী, যথার্থরূপেই আমরা আপনাকে

দেখেছি। বিশ্বাস না হয়, পনেরোখানা গ্রামের প্রত্যেক লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।—শশী বললে।

গৌরীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। মুখ নামিয়ে সে বললে, ওসব কথা এখন থাক্ শশী। নতুন খবর কিছু আছে?

—আছে। বংশী বাগদীকে দিয়ে ম্যানেজারবাবু গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, জমিদার পণ্ডিতদাদার প্রাপ্য বৃত্তি আর দেবেন না। মিছিমিছি অপমানিত হ'তে যেন তিনি আর সেখানে না যান। আর অনুরোধ করেছেন, তিনি খবর পাঠিয়েছেন একথা যেন গোপন থাকে। পণ্ডিতদাদাকে শ্রদ্ধা করেন বলেই এই ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন।

নিমেষের মধ্যে গৌরীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, বুঝেছি।

—আরো একটা সংবাদ আছে।—শশী বললে, যতদূর খবর পেয়েছি, তাতে পুলিশ শুধু বনশ্রীতেই আসেনি, আরো দু'চারখানা গ্রামে শুভ পদার্পণ করেছে। অন্ততঃ শ্রীচরণ, রাজারগাঁ আর কেশবপুর এই তিন জায়গায় যে তাদের আবির্ভাব হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

—কাকেও গ্রেপ্তার করেছে?

—না দেবী, গ্রেপ্তারও নয়, তল্লাসীও নয়। মিষ্টি কথায় সদুপদেশ দিয়ে গেছে। মোড়লরা তো তাই আমাকে বললে। বলেছে, পুরুষানুক্রমে জমিদারদের তোমরা সম্মান করে আসছ। জমিদারকে বাদ দিয়ে বাংলার চাষীদের কথা ভাবাই যায় না। আজ তোমরা যদি গ্রাম উন্নয়ন বা বন্যা প্রতিরোধ করতে চাও তো জমিদারের কাছে যাচ্ছ না কেন? তিনি তোমাদের সাহায্যই করবেন। তোমাদের সমবেত শক্তি আর তাঁর সাহায্য অসাধ্য সাধন করবে। তাঁকে বাদ দিয়ে একটা মেয়ে আর একটা বাউণ্ডুলে বামুনকে নিয়ে করবে গ্রামের উন্নতি? একি সম্ভব?

—মোড়লরা কিছু জবাব দিয়েছে ?—গৌরী জিজ্ঞাসা করলে।

—না। ওরা কিছু বলেনি। পুলিশ ওদের সকলকেই বলে গেছে জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে।

—ভালো।—হাসল গৌরী।

সোমনাথ বললে, জমিদারকে তাহলে বনশ্রী গ্রাম রক্ষা সমবায়ের সভ্য ক'রে নিন্।

—সেই প্রস্তাবই ভালো।—গৌরী বললে, আমরা কিন্তু আর সময় নষ্ট করব না।

ধাত্রীর রজত-শুভ্র জলধারা খরতর বেগে বয়ে চলেছে। নদী ক্রমেই হচ্ছে প্রশস্ততর। তার জলতরঙ্গে সাগরের সুরের অনুরণণ অনুভব করা যায়। এক বিশাল বিস্তারের অভিমুখে ভৈরবছন্দে অগ্রসরমান জলরাশি উদ্দীপনায় যেন হয়ে উঠছে আত্মহারা।

তীরবর্তী পথ ধরে চলেছে গৌরী আর সোমনাথ।

ইতিমধ্যেই শ্রীচরণ আর কেশবপুর পরিক্রমা তারা শেষ করে ফেলেছে। একখানা মাঠ পার হয়েই ঢুকবে রাজার গাঁয়ে।

শ্রীচরণ আর কেশবপুরের সংবাদ মোটমুটি উৎসাহপ্রদ। গ্রামবাসীরা পুলিশের আবির্ভাবে আতঙ্কিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সর্বত্রই তারা একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করেছে। সে উত্তেজনার মূলে আছে একশচুয়াল্লিশধারা।

স্থানে স্থানে গৌরী প্রশ্নও করেছে, জমিদারের কাছে কি তোমরা যেতে চাও?

—না দেবী। বানের জল রোখ্‌বার জন্যে জমিদার কখনও কিছু করেনি, আজ হঠাৎ তার এত আগ্রহ কেন? আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চরি?

—বেশ। কিন্তু একথাও ভুলে যেও না, আমরা যে পথে চলব সে পথে বাধা-বিপত্তি অনেক কিছু আছে। তবে সেই বাধা-বিপদ তুচ্ছ করতে পারলে পরিণামে জিতব আমরাই। আমাদেরই ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে থাকবে, বানের জলে ভেসে যাবে না। আর জমিদারের কাছে গেলে আর কিছু হবে না, শুধু নষ্ট হবে একতা। প্রায় প্রতি বৎসরেই বানের জলে গাঁ ভেসে যায় কিন্তু জমিদার তার খাজনা কোন বছর ছাড়েনি এ কথা মনে রেখো। ভিটে-মাটি বেচেও খাজনা দিয়েছে এমন অনেক লোকই এ গাঁয়ে আছে।

—আছেই তো। সভায় আমরা যা ঠিক করেছি তার কোন নড়চড় হবে না দেবী। কারো কথায় আমরা ভুলব না।

প্রসন্ন মুখে গৌরী নেমেছে পথে। গ্রামশুদ্ধ লোক এসে জড়ো হয়েছে তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য। তাদের মুখে যে শ্রদ্ধার প্রকাশ সোমনাথ দেখেছে তাতে গৌরীর প্রভাব সম্বন্ধে তার বিস্ময় হয়ে উঠেছে সীমাহীন। শুধু নামে নয় তাদের হৃদয়ের আসনেও সে যে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা সে সম্বন্ধে তার মনে কোন সংশয় নেই।

রৌদ্রের উত্তাপ বাড়ছে। সূর্য ক্রমশই মাথার ওপরে আসছেন উঠে। আকাশের নীলে সাদা সাদা মেঘের সমারোহ। ভিজে গামছা মাথায় পাট করে চাপা দিয়েছে গৌরী আর সোমনাথ।

তারা মাঠ পার হচ্ছে দ্রুতপদে।

চলতে চলতে গৌরী বললে, শ্রীচরণ আর কেশবপুরের জন্য আমার বিশেষ চিন্তা ছিল না। তবে ওই দুটো গ্রামেই কয়েকঘর সম্পন্ন চাষী আছে তারা আমাদের সমর্থন করবে না।

—সম্পন্ন ব'লে?—সোমনাথ প্রশ্ন করলে।

হাঁ।—উত্তর দিলে গৌরী, ওই যে শ্রীচরণে শুনলেন অনন্তদাস বলে একটি লোকের কথা যার বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে আলাপ-সালাপ ক'রে

এসেছে ওই লোকটি ওখানকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী। ওর একটি ছোট দলও আছে।

—সংগ্রামের সময় ওই সব লোকগুলি তাহলে জমিদার আর পুলিশের পক্ষ থেকে ছোট ছোট পকেটের কাজ করবে?

সোমনাথের কথায় হেসে ফেললে গৌরী, বাবা, একেবারে সামরিক পরিভাষা সুরু করলেন যে?

—কি করি, আপনি এমন ঘটনাচক্রের সৃষ্টি করেছেন যে রাতারাতি আমাকে আধা-সামরিক হয়ে উঠতে হয়েছে। এখানে এসেই শুনেছি যুদ্ধের তুর্যনিনাদ। সুতরাং 'যুদ্ধং দেহি' বলা ছাড়া আর উপায় কি আছে?

—নেই।—গৌরী বললে, কিন্তু আপনি সম্বোধনটা ছাড়ছেন কখন? গৌরী পর্যন্ত উঠেছিলেন, তাতে আনন্দই পেয়েছিলুম। আবার আপনি সুরু হ'লে কিন্তু দুঃখিত হব।

—ওটা দুজনে একসঙ্গে ছাড়বার চেষ্টা করলে হয় না?—সোমনাথ বললে।

অপ্রতিভ হল গৌরী। কিছুক্ষণ পরে বললে, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এত অল্প দিনের পরিচয়ে আপনি সম্বোধন ছাড়া কথা বলা কি সম্ভব?

—তাই যদি হয়, তাহলে একজন ভদ্রমহিলাকে দুদিনের দেখাশোনায় তুমি বলে সম্বোধন করবার মত অসভ্যতা আমার পক্ষেই বা সম্ভব হয় কি করে?

—ভদ্রমহিলা আমি নই।—হাসল গৌরী।

—আমিও ভদ্রলোক নই। কিন্তু ভদ্রতার খোলস দুজনের গায়েই আছে। বাধছে এইখানে।

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে গৌরী বললে, আপনি বড্ড বাজে বকেন।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা না বলে পুরুষরা থাকতে পারে না। সোজা কথা বলুন, আমাকে এবার থেকে 'তুমি' বলবেন কি না?

—ভদ্রলোকের চুক্তি একটা করলে বলতে পারি।

—তার মানে?

—দুজনেই দুজনকে তুমি বলে ডাকব।

—ঘুরে ফিরে সেই এক কথা। এইজন্যই বলছিলুম পুরুষরা সরল নয়।—গৌরী বললে।

—মেয়েরাই তাদের জটীল করে তুলেছে।—উত্তর দিলে সোমনাথ।

—একথা ভুল। গৌরী বললে, পুরুষের সংস্পর্শে এসে মেয়েরা হয়েছে জটীল।

—কি করে? পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, পৃথিবীর যে কোন মহাকাব্য, এর বিপরীত কথাই বলবে।

—সে সব যে পুরুষের রচনা।—হাসছিল গৌরী।

—বেশ, সে সব না হয় বাদ দিলুম কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করব কি করে?—গম্ভীর কণ্ঠে সোমনাথ বললে।

—আপনাকে কিছুই অস্বীকার করতে হবে না। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।—সোমনাথকে ফেলে দ্রুতপদে গৌরী কয়েক পা এগিয়ে গেল।

—আপনাকে ফেলে আমি আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারি, কিন্তু পুরুষসুলভ ঔদার্য্যের বশে শুধু যাচ্ছি না সে কথাটা মনে রাখবেন।—পিছন থেকে সোমনাথ বললে।

—ওটা ঔদার্য নয়, অহমিকা।—গৌরী বললে, এই জাতীয় কথা বলেই আপনারা প্রমাণ করতে চান যে নারী দুর্বল। আপনি যে পুরাণ আর ইতিহাসের কথা বলছিলেন তাতে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে নারীর দুর্বলতার। কিন্তু সত্য কথাটা কি জানেন? প্রভুত্বদর্পী পুরুষ চিরদিনই

নারীকে ছোট করে আসছে। তাদের দাবিয়ে, দমন করে, অপমান করে, এমন কি ঔদার্য দেখিয়েও নারী যে কৃপার পাত্রী সেই কথাই বারংবার প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে।

—এখন কি তাহলে এই রোদে মাঠ ভাঙতে ভাঙতে নারী পুরুষের দ্বন্দ্বই চলবে?

—চলবেই ত।—গ্রীবা উন্নত করে ফিরে দাঁড়াল গৌরী, সম্বোধন আপনি থেকে তুমিতে না নামা পর্যন্ত এ দ্বন্দ্বের শেষ হবে না।

—তাহলে শুনে রাখুন আমার উত্তর। পুনরাবৃত্তির অপরাধ নেবেন না। যদি আপনি থেকে তুমিতে নামতেই হয় তাহলে দুজনে একসঙ্গেই নামব। নচেৎ নয়। এজন্য দ্বন্দ্ব চললেও আমি পিছ্-পা নই।

হাসতে হাসতে দুজনে অগ্রসর হ'ল আবার। রৌদ্র নয়, আকাশ থেকে যেন আগুণের ধারা নেমে আসছে। তার সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম ও উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ। দুজনেই গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠল। মাঠে মুনিষেরা কাজ করছিল। তারা সকলেই গৌরীকে চেনে। যোড়হাতে নমস্কার করে তাদের কেউ কেউ তার কুশল জিজ্ঞাসা করলে ছুটে এসে। কেউ বা এসে দাঁড়াল মুখে গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে।

—রাজার গাঁয়ে যাবেন দেবী?—একজন জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ।—গৌরী হেসে বললে।

—এত রোদে বেরোলেন কেন?

—তোমরাও তো রোদে কাজ করছ?—হাসতে হাসতেই গৌরী বললে।

—আমাদের কথা বাদ দিন।—একজন বললে, আমাদের আবার রোদ আর জল। দিনমজুরী যারা করে তারা কি মানুষ?

—তারা তাহলে কি?—স্নিগ্ধ কণ্ঠে সোমনাথকে এই প্রশ্ন করতে দেখে সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখলে।

হাস্ততরল কণ্ঠে গৌরী বললে, শুধু চেয়ে দেখলে হবে না। উত্তর দাও ওঁর কথায়। বল তোমরা কি?

কেউ উত্তর দিলে না। তাদের মৌন দৃষ্টির সম্মুখে যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা ভীড় করে দাঁড়াল। হয় তো সত্য সত্যই তারা একবার ভাবতে চেষ্টা করলে যে তারা কি?

গম্ভীর কণ্ঠে সোমনাথ বললে, আমরা কি মানুষ, এ আক্ষেপ কেন ভাই? আমরা সত্যিই মানুষ। জোর দিয়ে এই কথা বল। আমরা মানুষ। তার পরিচয় দাও।

তবুও সকলে চুপ করে রইল। শুধু পরস্পরের দিকে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে তারা। মুখে কোন উত্তর যোগাল না।

সোমনাথ হাসল। বললে, চুপ করে থাকলে চলবে না। আমরা মানুষ এই পরিচয় আজ, নয়ত কাল, না হয় দুদিন বাদে দিতেই হবে নচেৎ আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। জলের অভাবে তোমাদের রোওয়া বীজধানের চারাগুলো যেমন করে মরে যাচ্ছে এমনি করেই আমরা মরব।

একজনের কণ্ঠে কথা ফুটল, কি করে পরিচয় দোব?

—কেন? ধানের চারাগুলোকে মরতে না দিয়ে।—সোমনাথ বললে, আকাশ থেকে জল না পড়লে অন্য উপায়ে জল আনতে হবে যাতে তোমার ফসল ফলে। তেমনি যে কোন দিক থেকে বাধা এলে সেই বাধা ভাঙতে হবে। এমনি করেই মানুষ তার নিজের পরিচয় দেয় আজ আকাশে জল নেই, কাল থেকে যদি বৃষ্টি সুরু হয় আর ধাত্রীর কূল ছাপিয়ে বানের জল গাঁয়ে এসে ঢোকে, কি করবে ভাই? হায় হায় করতে করতে শুধু বুক চাপড়াবে?

এতদিন তো তাই করেছে তারা। অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কোন কিছু করবার কথা চিন্তা করেনি। নিঃশব্দে কর্তব্যকর্ম

হিসাবে প্রত্যেক বৎসর মাটিকে কর্ষণ করেছে। জীর্ণ মৃত্তিকাস্তূপে রোপণ করেছে বীজ। কোন বছর ফসল পেয়েছে, কোন বছর পায়নি। বন্যার জলে অজস্র শস্যসম্ভার কোন বছর নষ্ট হয়ে গেছে। স্পন্দিত মৃত্তিকাস্তূপ মৌন আর্তনাদে উতলা হয়ে উঠেছে। সেই আর্তনাদ এদের কানে হয়েছে প্রতিধ্বনিত। চোখের জলে এদেরও বুক ছাপিয়ে বান ডেকেছে। মর্মস্থল আলোড়িত ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস এসেছে বেরিয়ে। জমাট অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে পাঠিয়েছে তারা করুণ প্রার্থনা।

প্রার্থনা করতেই জানে তারা। প্রেরণা তাদের জীবনে কোনদিন ছিল না।

সেই প্রেরণা তাদের জীবনে নিয়ে এল গৌরী আর পণ্ডিত। আজ গৌরীর সঙ্গে আর একজন এসে উপস্থিত হয়েছে সেই প্রেরণাকে স্পষ্টতর করে তুলতে। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিতে করণীয় কাজকে সামনে তুলে ধরতে।

যে কথা বলেছিল সে এবারেও কথা বললে, আজ্ঞে, বানকে রোখবার ব্যবস্থা তো আমরা করছি।

—তা জানি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রুখবে তো? তোমাদের জীবন-মরণের সমস্যার সামনে যদি জমিদার আসে, আসে পুলিশ, পিছিয়ে যাবে না?

—না।—এবার সকলে সমস্বরে বললে।

—যদি জান্ নিয়ে টানাটানি হয়?—রৌদ্রে ও উত্তেজনায় সোমনাথের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল।

সব চেয়ে বয়োবৃদ্ধ মানুষটি এগিয়ে এল। তার দেহ নুয়ে পড়েছে। মুখ পাকা গোঁফ-দাড়িতে ভর্তি। গাছের শিকড়ের মত কপালের শিরাগুলো এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে মাথার ঝাঁকড়া চুলের জঙ্গলে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে, আমাদের কথার নড়্‌চড়্‌ হবে না। আমরা যা বলছি তা নিশ্চয় করব।

—এই ত মানুষের মত কথা।—আবেগে সোমনাথ তাকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

গৌরীর বিশাল চোখ দুটি পরম প্রাপ্তির পুলকে যেন হয়ে উঠল ইঙ্গিতময়।

রাজার গাঁয়ে ঢুকল সোমনাথ আর গৌরী।

রোদের তেজ কমে এসেছে। ছায়া-নিবিড় পল্লীর আঁকা-বাঁকা সরু পথে অপরাহ্ণের প্রশান্তি। ধাত্রীকে পিছনে ফেলে এসেছে তারা। প্রকাণ্ড মাঠখানা রচনা করেছে ব্যবধান তাদের আর নদীর মধ্যে।

পল্লীপথ নির্জন নয়। পুকুর-ঘাটে মেয়েদের ভীড় জমেছে। হাসি ও কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে ঘাট। সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা থেকে সুরু করে পরনিন্দা পরচর্চা অবধি অবাধে চলছে সেখানে।

গ্রামের মেয়েরা দিনান্তের এইটুকু সময়ই স্বাধীনতা উপভোগ করে সারা দিন-রাত্রির বন্ধন জর্জরিত জীবনে, সাংসারিক ব্যস্ততার ফাঁকে, সহস্র চিন্তা ও উদ্বেগের জাল কেটে কলসী কাঁখে নিয়ে এই সময় বেরিয়ে পড়ে তারা। পুকুর-ঘাট তাদের ডাকে। জলের ছল-ছলাৎ শব্দ কখন শুনতে পাবে সারাদিন সে জন্য মনে থাকে একটি উন্মুখ প্রত্যাশা।

মধুর একটি অবকাশের মত তারা উপভোগ করে এই মুহূর্তগুলি। উপভোগ করে তাদের জীবনের এই একমাত্র বিলাসকে।

শিক্ষা-দীক্ষা নেই, নেই রুচীবোধ, দৃষ্টির বাইরে যে বিরাট একটা পৃথিবী আছে গতির আনন্দে উন্মাদ হয়ে, স্থিতির জড়তায় নিশ্চলের মত বসে সে কথা তারা অনুভবই করতে পারে না। কেউ বলতে গেলে, কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ধ'রে চুপ করে শুধু চেয়ে থাকে। মনের ভিতরে চলে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।

কে খোঁজ রাখে এসবের? কি প্রয়োজনই বা খোঁজ রাখবার? কোন সুদূর অতীতে, কৈশোর অথবা যৌবনের প্রারম্ভে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বধূবেশে তারা এসে ঢুকেছিল এই গ্রামে। তারও আগে, বাল্যেও কেউ কেউ এসেছে। তারপর তারা হয়েছে জায়া ও জননী। এক একটি সংসারকে কেন্দ্র করে ডুবে গেছে তারা তারই ভিতরে। মনের মধ্যে সৃষ্টি করে নিয়েছে স্বতন্ত্র সুখ ও দুঃখ। সেই সুখ-দুঃখ আবর্তিত হচ্ছে গণ্ডীবদ্ধ এই গ্রামকে কেন্দ্র করে। গ্রামের বাইরে কি আছে সে প্রশ্ন তাদের মনে জাগবে কেন? সে অবসর তো নেই।

বাইরের পৃথিবী কোথায় রক্তাক্ত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে কে জানে তার ইতিহাস। নিরুদ্বেগ অচলায়তন শতাব্দীর পর শতাব্দী কালের আঘাত সহ্য করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, অতীতের নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে চেয়ে। তার ভয়ঙ্কর মৌনতার সম্মুখে ভবিষ্যতের

জ্যোতি প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। আনন্দহীন, নির্জন ও পরিত্যক্ত সমাধি-ক্ষেত্রের মত সেই অচলায়তন শুধু বিভীষিকার সৃষ্টিই করে।

তাই পুকুরঘাটে এসে অচলায়তনের এই জীবগুলি প্রকাশ করে শুধু তাদের মনের অন্ধকারকে। যে স্বাধীনতা বিস্ময়কর হয়ে উঠতে পারত নতুন চিন্তার উন্মেষে, দৈনন্দিন অবকাশের সেই স্বাধীনতা পর-চর্চায় হয়ে ওঠে ক্লেদাক্ত।

খানিকটা নিজেদের সাংসারিক আলোচনা আর বাকীটা সত্য-মিথ্যায় মিশানো প্রতিবেশীর নিন্দা! অবকাশটুকু এইভাবে কাটিয়ে শূন্য কুম্ভ ভরে উঠে পড়ে তারা মনে একটি প্রসন্নতা নিয়ে।

অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু হিসাবে তার নিশানা মেলে না।

এই জীবন নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। অন্য কোন জীবন তারা চায় না, বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় যা সমৃদ্ধ, বিপুল সম্ভাবনায় যা ঐশ্বর্যময়।

কিন্তু সময়ের গতি অপ্রতিরোধ্য। জীর্ণ অট্টালিকার ফাটলে-ফাটলে যেমন করে বট ও অশ্বত্থের চারা গজিয়ে ওঠে এক বিধ্বংসী পরিণামের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে তেমনি করে এই অচলায়তনেও জেগে উঠছে মৃত্যু-শিহরণ। অন্ধকারের এই সুদৃঢ় দুর্গে আলো আসেনি এসেছে উত্তাপ। জ্যোতির প্রকাশে নয়, জড় প্রাণীগুলি অস্থির হয়ে উঠেছে বহ্নিদাহে।

অভাব নিয়ে এসেছে জ্বালা। আর সেই জ্বালা তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবী এসেছে এখানে পণ্ডিতের হাত ধরে।

দেবীকে দেখেছে তারা বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে। প্রথমে আমল দেয়নি কিন্তু তার ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করতেও পারেনি। তারপর কখন যে সে তাদের হৃদয় অধিকার করে নিয়েছে সে কথা হয়তো আজো তাদের অজ্ঞাত।

এখন দেবী এলে মন্ত্রমুগ্ধের মতই তারা তার কথা শোনে। যে যার

দুঃখের কথা নিবেদন করে তারই কাছে। দুঃখ মানে, অভাব আর ব্যাধি।

আজো তারা ছুটে এল পুকুর-ঘাট থেকে কোলাহল করে, দূরে দেবীকে আসতে দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ঢেকে দাঁড়াল অবগুণ্ঠনে। পিছনে আছে সোমনাথ।

—কি যশোদার মা, ভালো আছ ত?—একমুখ হেসে গৌরী বললে।

—ভালো আর কি মা?—ফিস্ ফিস্ ক'রে যশোদার মা বললে, একটা ছেলের কালাজ্বর, মেয়েটা নিবারের ব্যায়রামে ভুগতেছে, ভালো কি আর ভগবান রেখেছেন? তার ওপর এবারে এখনো চাষই হ'ল না।

—সে দুঃখ সকলের।—গৌরী বললে, বর্ষার সময় এসে গেল অথচ আকাশে এক ফোঁটা জল নেই। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই সকলে হায় হায় করছে।

—আহা, তা আর করবেনে? মানুষ খাবে কি? দেশ-জোড়া হাহাকার পড়ে গেল যে? হ্যাঁ মা, এবারেও কি আকাল হবে?—যশোদার মার কণ্ঠে আতঙ্ক?

—না।—হাসল গৌরী। বললে, এ বছর যাতে আর আকাল না হয় তার ব্যবস্থাই করতে এসেছি।

—ও মা, তাই নাকি? কি করবে মা? কি করবে?—শুধু যশোদার মা নয়, সমবেত সকলেই গৌরীকে ঘিরে ধরল। সোমনাথের কথা বোধ হয় তখন আর কারো মনে ছিল না।

—আজ রাত্রিতে যে যার রান্না-বান্না চুকিয়ে সকলে গোলোক বাগের উঠনে আসবে। সেইখানেই সব কথা বলব। তোমরা এখন যাও। আমি শুধু ক্ষান্তর সঙ্গে একটু কথা কইব।

—এখন কি ক্ষ্যান্তদের ওখানেই উঠবে মা?—যশোদার মা বললে।

গৌরী বললে, না, ক্ষান্তর সঙ্গে ছুটো কথা কয়েই যাব গোলোক বাগের বাড়ী।

ততক্ষণে একটি অল্পবয়সী বিধবা এসে গৌরীর পাশে দাঁড়িয়েছে।

ভীড় তাড়িয়ে গৌরী বললে, কি খবর ক্ষান্ত ?

—খবর ভালোই দেবী।

—তুমি কতদূর এগোলে ?

—বোধ হয় অ—নে-ক দূ-র।—হেসে উঠল ক্ষান্ত।

সোমনাথ চেয়েছিল মেয়েটির দিকে। পিচের মত কালো রঙের যে এত শ্রী ও সুষমা থাকতে পারে সে তা জানত না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

তার দিকে চেয়ে মাথার কাপড় টেনে দিলে ক্ষান্ত। তারপর বললে, বাড়ীতে চলো, সেখানে সব বলব।

—বাড়ীতে তো তোমাকে একলা পাব না। এখানেই সব বলতে হবে। ওঁর সামনে তোমার লজ্জা করবার প্রয়োজন নেই। ওঁকে তুমি দাদা বলে ডেকো।

মৃদু হাসল ক্ষান্ত। বললে, বাড়ীতে এখন আমি একাই থাকি।

পথের ধারেই পুরানো একটি শিবমন্দির। তার সামনে তলা বাঁধানো বিরাট এক বটগাছ বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। গৌরী ক্ষান্তকে নিয়ে বসল গিয়ে সেই গাছের নীচে। মৃদু হেসে সোমনাথকে বললে, বসুন।

দূরত্ব রক্ষা করে সোমনাথও বসল।

গৌরী বললে ক্ষান্তকে, এখন বলো দিকি সব। সংক্ষেপে অথচ তাড়াতাড়ি সব কথা বলতে হবে। আমার অনেক কাজ।

ক্ষান্ত মুখ নীচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ যখন মুখ তুললে তখন সে কাঁদছে।

—দূর পাগলী, কাঁদিস্ কেন?—তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে গৌরী বললে, তোকে তো আর একদিন বলেছিলুম, জীবনে কোন দুঃখই বড়ো নয়, জীবনটাই বড়ো।

তোমার সেই কথাই তো আমি জপমালা করেছি দেবী। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষান্ত বললে, তোমার কথাতেই আজ আমি আমার জীবনের সব কিছু ছাড়লুম।

—বেশ করেছিস্। সব যখন ছেড়েছিস্ তখন সমস্তই আবার পাবি। আমার এই কথাটাও আজ থেকে জপ করিস্। এখন কি করেছিস্ তাই বল্। নটবর কোথা?

—বিয়ে করেছে।

—বিয়ে করেছে?—বিস্ময়ে ও বেদনায় নিমেষে গৌরীর মুখ মলিন হয়ে উঠল।

ক্ষান্ত বললে, না, না, তার দোষ নেই। আমিই জোর করে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে গৌরী বললে, সে রাজী হ'ল?

—কিছুতেই রাজী হবে না, শেষে লোভ দেখিয়ে রাজী করলুম।

—লোভ দেখিয়ে?—গৌরীর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি।

—হ্যাঁ। কিশোরী বাগ ছিল বড্ড গরীব? তারি মেয়ে লক্ষ্মীকে সে বিয়ে করেছে। আমার স্বর্বস্ব তাকে দিয়েছি দেবী। বাড়ী ঘর এমন কি বাবা যা নগদ টাকা দিয়ে গিছল তাও। একখানা কুঁড়ে বেঁধে আমি এখন আছি রাধানাথকে নিয়ে।

—সে কি?—গৌরী বললে, তুই যে নিঃসম্বল হয়ে গেলি?

তোমারি কথায় দেবী, নিঃসম্বল যখন হয়েছি তখন সম্বলও আবার আসবে। এখন আমার আর কেউ নেই একমাত্র রাধানাথ ছাড়া। তাঁকে নিয়েই আছি। আর চেষ্টা করছি তোমার কাজ করতে।

পাণ্ডুর মুখে গৌরী বললে, যাক, একদিক দিয়ে তুই নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমার ধারণা ছিল নটবর আর বিয়ে করবে না।

—তার কোন দোষ নেই। যে লোভ তাকে দেখিয়েছিলুম সে লোভ সাম্‌লানো শক্ত। অন্যায় আমারই হল, কিন্তু এ ছাড়া আমারই বা কি উপায় ছিল? সে সামনে থাকলে আমি কোন কাজই করতে পারতুম না।

—হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। গাঢ় স্বরে বললে, আজ সেই আমার রাধানাথ! এতদিন পরে আমি সত্যি-সত্যি শান্তি পেয়েছি দেবী। কায়মনোপ্রাণে এবার তোমার কাজ করতে পারব।

—আমার কাজের আরম্ভ আজ রাত্রি থেকেই।—গৌরীও উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে, গোলোক বাগের বাড়ীতে আসিস। সমস্ত কথা সেইখানেই হবে। আগে পুরুষদের সভা, তারপর মেয়েদের।

গৌরীকে প্রণাম করে সোমনাথকেও প্রণাম করলে ক্ষান্ত। সোমনাথ বাধা দিতে গেল। গৌরী হেসে বললে, থাক, ওকে বাধা দেবেন না। ও যদি প্রণাম করে শান্তি পায় ত পাক্ না।

মৃদু হাসল ক্ষান্ত। তারপর বললে, দাদা হলেন ত, দেবীকে নিয়ে বাড়ীতে একবার আসবেন দয়া করে?

—যাব।—সোমনাথ বললে।

চলে গেল ক্ষান্ত। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিছল সোমনাথ। কোথা থেকে এল এই ক্ষান্ত? রহস্যময়ীর মতো অতর্কিতে একেবারে দৃশ্যপটের সম্মুখে এসে একি এক বিচিত্র জীবনের ইঙ্গিত সে দিয়ে গেল?

—আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না?—গৌরী বললে।

—হয়েছি।—উত্তর দিলে সোমনাথ।

—অদ্ভুত মেয়ে। ওর বাবা খুব বড় লোক ছিল। তার একমাত্র মেয়ে। সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়ে আট বছরে বিধবা হয়। একটু লেখাপড়াও শিখেছিল মেয়েটা।

—তারপর ?

—নটবর ওর ছেলেবেলাকার সঙ্গী। ভালো বেসেছিল ওকে। বিধবা বিয়ে করবার জন্য প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল। তাই স্বর্বস্ব খুইয়ে তার বিয়ে দেওয়ালে লক্ষ্মীর সঙ্গে।

সন্ধ্যার অন্ধকার অকস্মাৎ যেন থম্‌থম্‌ করে উঠল। গৌরী বললে, চলুন, গোলোকবাগের ওখানে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

তার কণ্ঠস্বর শুনে সোমনাথের মনে হল সে যেন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সোমনাথ নিজেও ক্লান্তিবোধ করছিল।

গোলোকবাগের বাড়ীতে ঘরোয়া সভার কাজ শেষ করে গৌরী আর সোমনাথ এসে উঠল ক্ষান্ত'র কুঁড়ে ঘরে।

সভায় ক্ষান্তও গিছল। তার সঙ্গেই এল তারা। গ্রামের একেবারে প্রান্তদেশে এসে ক্ষান্ত বাসা বেঁধেছে। পরিচ্ছন্ন কুঁড়ে ঘর। খড়ে ছাওয়া।

উঠানে তুলসী মঞ্চের নীচে প্রদীপটি তখন নিভু নিভু। সেটির শল্‌তে উস্‌কে দিয়ে মৃদু হেসে ক্ষান্ত বললে, যতক্ষণ জ্বলে!

—নিশ্চয়।—গৌরীও হাসল। বললে, এমনি করেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে। নিভতে দেওয়া হবে না।

ঘরে উঠল তারা। ছোট একখানি ঘরে ক্ষান্ত থাকে। কোনরকম বাহুল্যতার নামমাত্রও নেই সেখানে। একধারে দেয়াল ঘেঁষে তার রাধানাথের সিংহাসন। আর একদিকে ছোট একটি বিছানা গুটানো। সেই বিছানা পেতেই সে বসতে দিলে গৌরী আর সোমনাথকে।

নানারকম বিচিত্র বর্ণের ফুলে রাধানাথ আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। সেই দিকে চেয়ে সোমনাথ বললে, এত রকমের ফুল কি রোজই যোগাড় করতে হয়?

—যোগাড় করতে হয় না। এসবই আমার বাগানের ফুল।

—বাঃ! তাহলে চমৎকার ফুলের বাগান করেছেন বলুন?—প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে বললে সোমনাথ।

—শুধু ফুল নয়, বাগানে আমার তরীতরকারীও হয়।—ক্ষান্ত বললে।

—তরীতরকারী তো গ্রামে সকলের বাড়ীতেই হয়, ফুলগাছও অনেকের থাকে কিন্তু সব রকম ফুলের এই যে সংগ্রহ এর মধ্যে বিশিষ্ট একটি রুচীর পরিচয় আছে।

হাসল ক্ষান্ত। বললে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আমাদের আবার রুচী! রাধানাথ আমার সব রকমের ফুলে সেজে থাকতে ভালবাসেন। তাই তাঁর জন্যই ফুল বাগান করতে হয়েছে।

—পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কি রুচী থাকতে নেই?—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে সোমনাথ।

—নেই বলেই তো জানি।—ক্ষান্ত বললে, অন্তত আমার তো নেই। কেনই বা থাকবে? না আছে রূপ, না আছে গুণ। জীবনটা সাত-বছরে আরম্ভ করে আট-বছরে যখন শেষ হয়ে গেল তখনো ভালো করে কিছু বোঝবার ক্ষমতাই হয় নি। তারপর বুঝতে যে দিন শিখলুম, সেদিন এইটুকুই শুধু বুঝলুম যে আমার এই জীবন একটা বোঝা। এই বোঝা বয়েই আমাকে চলতে হবে।

—এমন বোঝা যদি আমরা বইতে পারতুম।—মুখ টিপে হেসে বললে গৌরী।

—অমন কথা বলো না দেবী। আগের জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম তাই এই নরক ভোগ করছি। দোহাই তোমার, আসছে জন্মেও যেন আবার নরকে না ডুবতে হয়।

—নরকে ডুববি কেন? আসছে জন্মে স্বর্গে যাবি তুই।—হাসতে হাসতে গৌরী বললে।

—সে যেখানে যাই·যাব। তুমি কিন্তু আর আমার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে যেও না।

—খুব অন্যায় করেছি, না?

—সেকথা বললেও আমার পাপ হবে। তোমার ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কি আমি করতে পারি?

গৌরী খিল্‌খিল করে হেসে উঠল। বললে, আমাকে তোরা শুধু ঠেলে ঠেলে ওপরে তুলছিস। এর ফল হবে এই যে, যেদিন আমি পড়ব সেদিন আমার চিহ্নও কেউ খুঁজে পাবে না।—কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। তারপর বললে, ছাখ্ এইটাই কি ভালো? কেন আমার কাজের দোষগুণের বিচার তোরা করবি না? আমি কি তোদের মত মানুষ নই? আকাশ থেকে ছিট্‌কে তো আর আমি তোদের মাঝখানে এসে পড়িনি? আমাকে তোদের পাঁচজনের একজন করে নিতে বাধে কেন?

—ওসব কথা তুমি গোলোকবাগের বাড়ীতে বসে ব'লো।

কেন, তোর কাছেই বা বলব না কি জন্যে?—তেমনি গম্ভীর কণ্ঠেই গৌরী বলতে লাগল, দেবী, দেবী আর দেবী! কাণ আমার ঝালাপালা হয়ে গেল! কে বললে আমি দেবী? আশে-পাশের পনেরোখানা গাঁয়ের কেউ আমাকে বুঝলে না? আমিও যে একজন মানুষ, আর সকলের মত আমারও যে সুখ-দুঃখ আছে, আমার জীবনও যে হাসি-কান্নায় ভরা একথা কি কেউ একবার ভেবেও দেখলে না? এমনও তো হতে পারে যে অনেকের মতো আমিও মর্মান্তিক দুঃখ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি? এমন কি সে দুঃখ হয়তো অন্য লোকের দুঃখের তুলনায় অনেক বেশী গুরুভার?

বিস্মিত সোমনাথ চেয়েছিল গৌরীর দিকে। সে অনুভব করছিল, গৌরীর গাম্ভীর্যের অন্তরালে উচ্ছ্বসিত অশ্রু টলমল করছে। যে অপ্রকাশ্য

বেদনাকে সন্তর্পণে ও সযত্নে সে অন্তরে লালন পালন করে চলেছে, যার আভাস মাত্র সে বাইরের জগতকে জানায়নি অকস্মাৎ তার প্রবলতা তাকে করে তুলেছে অভিভূত। সে আত্মসংবরণ করতে পারছে না। বিপুল উচ্ছ্বাসে ভাগীরথী যেমন ক'রে ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে গিছল, অপরীসিম নির্জনতার কেন্দ্রস্থল থেকে তার সযত্ন-সঞ্চিত মৌন বেদনা তেমনি করেই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে প্রকাশের সীমাহীন পিপাসায়।

কিন্তু কি এমন বেদনাকে সে যক্ষের মত রক্ষা করে চলেছে তার অপার মৌনতার অন্ধকারে? তার কি কোন পরিচয়ই পাওয়া যাবে না?

ক্ষান্ত একটু হাসল। মধুর হাসি। বললে, দেবী, সকলের দুঃখকে তুমি নিজের করে নিয়েছ। তাই সবগুলো গাঁয়ের লোকের তুমিই হয়ে উঠেছ সবচেয়ে আপন। এই অবস্থায় কেউ কি ভাবতে পারে যে তোমার নিজেরও সুখ-দুঃখ আছে?

—সত্যি কথা।—সোমনাথ বললে, সকলের দুঃখকে যে নিজস্ব করে নিলে সে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রশ্নে বিব্রত হবে কেন?

—হওয়াটা খুব অন্যায়, না?—গৌরীর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে বললে, সমষ্টির আহত অন্তরাত্মার আর্তনাদ কারো কানে এসে পৌঁছেচে বলে তার নিজের অন্তর্য্যামী'র কান্না সে আর শুনতে পাবে না? কাণে তুলো দিয়ে থাকবে? মন্দ বিচার নয়! মানুষকে পাথর বানাতে আপনারা খুব পারদর্শী।

— কি করব? পৃথিবী সেই শিক্ষাই যে আমাদের দিয়েছে।—সোমনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বললে, সমষ্টিকে যে একান্তভাবে আপনার করে নিলে তার মহত্বই আমাদের চোখে পড়ে। সেও যে মানুষ সে কথা আমরা ভুলে যাই। এ আমাদের চিরকালের চোখের দোষ।

—যা বলেছেন, আমরা নিতে জানি, দিতে জানি না।—আবার একটু মিষ্টি হাসল ক্ষান্ত। বললে, ওই জন্যেই তো আমি সুখ-দুঃখের ঝামেলা থেকে রেহাই চেয়ে নিয়েছি। যেদিন বুঝতে পারলুম, জীবন আমার একটা বোঝা হয়ে উঠেছে, সেই দিনই রাধানাথকে বললুম, এ জীবন আর আমার নয়, এ তোমার। এর বাঁধন থেকে আমাকে মুক্তি দাও ঠাকুর। তুমি সব নাও। আমার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সব তোমার। তুমি আমার এইটুকু শুধু আমাকে ভাবতে দাও। আমি তোমাকে নিয়েই থাকি।

—রাগ করো না ক্ষান্ত, তোমার এই কথাগুলো শুনে আমার নিজেকে তোমার চেয়ে অনেক ছোট বলে মনে হচ্ছে।—গৌরী বললে।

—আবার ওই কথা বলছ দেবী?—আহত কণ্ঠে বললে ক্ষান্ত।

—একবার নয় একশোবার ওই কথাই বলব। সত্যি যা আমি তাকে বরাবর অসঙ্কোচেই স্বীকার করি।—দৃঢ় কণ্ঠে বললে গৌরী।

—তোমার সত্যি তোমার কাছেই থাক, আমার কাছে ও সব মিথ্যে।—হঠাৎ আকুল হয়ে কেঁদে উঠল ক্ষান্ত।

—আবার কাঁদছিস?—গৌরীর কণ্ঠে উগ্রতা।

প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে ক্ষান্ত বললে, না কেঁদে যে পারি না দেবী। ছেলেবেলা থেকে শুধু কান্না চেপে চেপে বুকের ভিতরটা আমার শক্ত হয়ে গেল। যেন দম আটকে আসে। নটবর যেদিন এসে বললে 'ক্ষান্ত, তোকে আমি বিয়ে করব। আমাদের জাতে বিধবার বিয়ে হয়, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি যে শুধু কান্না চেপেই আসছি। নিজে কান্না চেপে চেপে তাকে কি কান্না যে কাঁদিয়েছি সে তুমি বললে বিশ্বাস করবে না। বাড়ী ঘর পুকুর ধানজমি তাকে দানপত্র করে দিয়েছি, সে কেঁদেছে। লক্ষ্মীকে যেদিন বিয়ে করতে যাবে সেদিনও

হাউ হাউ করে কেঁদেছে। আর পাষাণীর মত আমি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছি। রাধানাথকে বলেছি, আমাকে শক্তি দাও। পাথর হওয়ার শক্তি দাও ঠাকুর।

চোখ মুছল ক্ষান্ত। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, নটবরের দুঃখ আমার সহ্য হয়েছে। রাধানাথ দয়া করেছেন। কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হয় নটবরের চোখে আমি ছোট হয়ে গেছি। ছোট হয়ে আনন্দই পেয়েছি। এই আনন্দেই আমাকে থাকতে দাও। আমি ছোট নয়, সে কথা আমাকে শুনিও না।

—নটবরের চোখে তুই ছোট হয়ে গেছিস, একথা তোর মনে হল কেন?—গৌরী বললে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নীচু করে ক্ষান্ত বললে মৃদু স্বরে, তার ভালবাসার মর্য্যাদা তো আমি রাখিনি দেবী। অত বড় জোয়ান কিন্তু ভিখিরীর মত সে এসেছিল। জোর করেনি, করেছিল মিনতি। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। দাবী কিন্তু তার সত্যিই ছিল।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল গৌরী।

সোমনাথও নিঃশব্দ। শুধু এই অতি-সাধারণ নারীটির অসাধারণত্বের প্রতি তার মুগ্ধ মন বারংবার মৌন প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠছিল।

পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য দিয়ে যেন গড়া হয়েছে মধুর এই মেয়েটিকে। তার নিকষ কালো রঙে যেন নতুন আলোর অঙ্গীকার। অমাবস্যার মত সে যেন স্পন্দিত হচ্ছে পূর্ণচন্দ্রের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে।

হঠাৎ আবেগভরে সোমনাথ বলে ফেললে, তোমার মত বোন পেয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান।

ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রণাম করলে ক্ষান্ত।

গৌরী বললে, তোর এক নতুন পরিচয় নিয়ে আজ ফিরে যাচ্ছি। তোকে আমি চিনেছিলুম আগেই কিন্তু আজ করলুম আবিষ্কার। তোর

এই ছবি যতদিন আমি বাঁচব ততদিন আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। তবে একটা কথা তোকে বলে যাই, নটবরের চোখে ছোট নয় অনেক বড়ো হয়ে গেছিস তুই। সন্ধ্যাবেলা তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

—আমাকে আর ও কথা শুনিয়ো না।—ক্ষান্ত বললে।

গৌরী উঠে দাঁড়াল। ক্ষান্ত তাকেও প্রণাম করলে। তাকে বুকে টেনে নিয়ে গৌরী বললে, তোর রাধানাথ যেন এমনি করেই তোকে চিরদিন দয়া করেন।

সেই আশীর্বাদই করো। রুদ্ধকণ্ঠে বললে ক্ষান্ত।

উঠানে নেমে গৌরী বললে, গোলোক বাগের ওখানে অনেক আশাই তো পেলুম। তবু রাজার গাঁয়ের সব ভার তোর ওপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে চাই।

তাই থেকো।—ক্ষান্ত হাসল অনেকক্ষণ পরে।

তুলসীমঞ্চের প্রদীপ নিভে গিছল।

বেরিয়ে পড়ল তারা। ক্ষান্ত বিদায় নিলে।

চন্দ্রালোকিত নিঃশব্দ পৃথিবী।

গ্রাম সুষুপ্ত কি জাগ্রত তা বোঝা যায় না। অন্ধকারের সমস্ত মলিনতাকে নিঃশেষে মুছে দিয়ে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না তাকে করে তুলেছে অপরূপ। সামনেই ক্ষান্তর ফুলবাগান। বিচিত্র সৌরভে সুরভিত বাতাস হঠাৎ যেন গৌরী ও সোমনাথের দেহ-মনকে স্নিগ্ধ করে দিলে।

তারা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বাগানের সামনে।

ভিতরে খঞ্জনী বাজিয়ে মধুর কণ্ঠে ক্ষান্ত তখন গান ধরেছে ঃ

"সখী কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া"

তার পরদিন।

পনেরোখানা গ্রাম পরক্রমা শেষ করে তারা ফিরছিল।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ দীর্ঘ হয়ে এলিয়ে পড়েছে। অস্তায়মান রবির রক্তরাগ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে ধাত্রীর জলে। প্রখর স্রোতে দুলছে সেই প্রতিবিম্ব।

শ্রান্ত পদে চলেছে তারা।

পরিক্রমা একদিনে শেষ হয় নি। শেষ হওয়া সম্ভবও ছিল না। রাজার গাঁয়ে রাত্রি যাপন করে প্রত্যুষে বেরিয়ে ভ্রমণ শেষ করতে অপরাহ্ণ হয়ে গেল। বনশ্রীতে পৌছুতে রাত্রি হবে।

তবু আজ তাদের পৌছাতেই হবে। সেখানে কি হচ্ছে সেই খবরের জন্য দুজনেই উদ্বিগ্ন। পণ্ডিত কলকাতা থেকে কি করে এলেন সেকথা জানার আগ্রহও কম নয়।

তাদের মনে অবর্ণনীয় প্রসন্নতা। অভূতপূর্ব উৎসাহ তারা প্রত্যক্ষ করেছে প্রত্যেকখানি গ্রামে। তাদের প্রস্তাব যে সকলেই গ্রহণ করেছে আন্তরিকভাবে, তার চরম প্রমাণ হৃদয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে তারা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নামছে ধীরে ধীরে। ধাত্রীর স্রোত হয়ে উঠেছে ধূসরাভ। কলকল ছলছল শব্দ যেন কোন দূরাগত রহস্যময় ধ্বনির মত

বয়ে নিয়ে আসছে কোন অনির্দিষ্ট আহ্বান। যে আহ্বানের অর্থ বোধগম্য নয়, কিন্তু ইঙ্গিতময় সুরের মত অনুভূতির জগতে তার পরিপূর্ণতা। চৈতন্যের মূলে তার স্পর্শ।

পৃথিবীতে শব্দের অস্তিত্ব চিরদিনই ছিল, ছিলনা একদা মানুষের অস্তিত্ব। সৃষ্টির আদিম উষায় শব্দ মানুষের উপলব্ধির জগতে কি বিপুল আলোড়নের সৃষ্টিই না করেছিল? পাখীর ডাক, নদীর কল্লোল, বন্যজন্তুর চীৎকার, বজ্রের প্রলয় গর্জন সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বের ঘোষণা বয়ে নিয়ে আসত না কি? প্রিয়ার কণ্ঠ গুহামানবের জীবনরসের পাত্রখানি পরিপূর্ণ ক'রে তুলত না?

শব্দ কি এইজন্যই ব্রহ্ম? শব্দ মানেই তো জীবন। সৃষ্টির প্রথম কথাই হ'ল ধ্বনি। আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে বয়ে চলেছে অবিশ্রাম ধ্বনির তরঙ্গ।

কিন্তু সেই শব্দ যদি হারিয়ে যায়, অনন্ত মৌনতা এসে গ্রাস করে ধ্বনির চপল লীলাকে স্থির মৃত্যুর মত স্পর্শ দিয়ে? শব্দহীন পৃথিবী কি ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার সামনে এসেই না দাঁড়াবে যদি তা কোনদিন সম্ভব হয়? কি সীমাহীন শূন্যতাকে অবলম্বন করেই না সে ঘুরছে, সেই সত্য বুঝি শুধু সেইদিনই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নির্মম, নিষ্ঠুর সত্য। আতঙ্কের মত, মৃত্যুর মত তার রূপ। তার আভাসমাত্র নিয়ে আসে প্রলয়ের অন্ধকার আর প্রকাশে জেগে ওঠে মহাপ্রলয়ের প্রচণ্ডতা।

শিপ্রার কণ্ঠ আজ স্তব্ধ, জীবনের অস্তিত্বটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলেই না? সেও তো ছিল ধাত্রীর মতই চঞ্চলা। কলহাস্য তাকেও তো রাখত পূর্ণ ক'রে, ধাত্রীর কলস্বন তার দুপাশের তীরভূমিকে যেমন ভাবে অহরহ ক'রে রাখে সজীব?

হঠাৎ সোমনাথ অনুভব করলে একটা ভয়াবহ নির্জনতা। ধাত্রীর কল্লোল সে শুনতে পেলে না। শুনতে পেলে না কুলায়-প্রত্যাগমনরত কোন পাখীর স্বর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর গতি যেন থেমে গেছে। শ্মশানভূমির স্তব্ধতা এসেছে নেমে। বাতাস পর্যন্ত বইছে না। আসন্ন কোন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন আকাশ থম্‌থম্ করছে। দিগন্ত প্রসারিত ধূ ধূ মাঠ নিঃশব্দে আছে উৎকর্ণ হয়ে।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে সোমনাথের। বুকখানা যেন ফেটে যাবে। গৌরী কোথা? গৌরী? ওই ত সামনেই সে চলেছে। সেও কি একটা কথা কইতে পারে না?

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রাণপণ চেষ্টায় শক্তি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগল।

সেই মুহূর্তে সত্যসত্যই একটা ঘটনা ঘটে গেল বিদ্যুতের মত।

অন্ধকার তখন ঘন হয়ে উঠেছে। সন্মুখবর্তিনী গৌরীকে দেখাচ্ছে একটা অস্পষ্ট রেখার মত। হঠাৎ পার্শ্ববর্তী মাঠ থেকে কয়েকজন লোক ছুটে এল। হাতে তাদের লাঠি। অস্পষ্টভাবে তাও দেখতে পেলে সে।

ব্যাপারটা কি ঘটছে বোঝবার আগেই তারা পিছন থেকে জাপটে ধরলে গৌরীকে।

—গৌরী! গৌরী! উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে উঠল সোমনাথ। শক্তি পেয়েছে সে। অসুরের শক্তি। প্রাণপণ বেগে সে ছুটল গৌরীর দিকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে তার পিছনেও একদল লোক যেন মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল। গৌরী তার কাছ থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না, তবু সেই পথটুকু অতিক্রম করবার অবসরও সে পেলে না। অকস্মাৎ প্রচণ্ডবেগে মাথায় এসে পড়ল লাঠি।

তার অপসৃয়মান চেতনা গভীর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে একটি শব্দে মাত্র একবার চকিত হয়ে উঠল। সে শব্দ 'ঝপাং' ক'রে তাকে নদীতে ফেলে দেওয়ার। তারপর চৈতন্যের কোন শিহরণ আর রইল না।

এঁটেল মাটির সরু পথের খানিকটা টকটকে লাল রক্তে ভিজে কালো হয়ে গেল।

গ্রামগুলো তোলপাড় করে ফিরছেন পণ্ডিত। সঙ্গে তাঁর শশী।

আশেপাশের পনেরোখানা গ্রামের সকলেই শুনেছে গৌরী আর সোমনাথ নিরুদ্দেশ। তাদের শেষবার দেখা গেছে সামন্তপুরে। সেখান থেকে তারা দুজনে ধরেছিল বনশ্রীতে ফিরবার পথ।

কলকাতা থেকে ফিরেই পণ্ডিত সংবাদ পেয়েছেন। ফিরতে তাঁর দেরী হয়েছে। তিনি পৌছানমাত্র বিবর্ণ শশী সংবাদটি তাঁকে শুনিয়েছে।

প্রৌঢ় আর বিশ্রামের অবসর পাননি।

গ্রামে জানাজানি হতেই গ্রামের লোক মশাল জ্বেলে দল বেঁধে বেরিয়েছে অনুসন্ধান কার্যে। প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি তাদের সরল অথচ কর্কশ মুখগুলোকে করে তুলেছে বীভৎস। একটা বিশ্রী সন্দেহের উদয় হয়েছে

তাদের মনে। যতই সেই সন্দেহ অন্তরে দৃঢ়মূল হচ্ছে, ততই তাদের মুখের কদর্যতা হয়ে উঠছে ভয়ঙ্কর।

দেবী কোথায়? দেবী? সকলেই জিজ্ঞাসা করছে।

পণ্ডিত স্তব্ধ। শশী অর্দ্ধ উন্মাদ। ন্যুব্জ মেরুদণ্ড জনার্দন প্রকাণ্ড একটা লাঠি নিয়ে আস্ফালন করছে, নোব, নোব এর শোধ। কোথায় রাখবে তাকে লুকিয়ে?

গ্রামে গ্রামে সংবাদ নিয়ে জানা গেল কোথাও তারা নেই। এতক্ষণ এই আশাটুকুও পণ্ডিত অন্তরে পোষণ করছিলেন যে কোথাও তারা রাত্রিযাপন করছে। তাদের বিলম্ব দেখে নিতান্ত উদ্বেগের বশবর্তী হয়ে শশী ঘটিয়েছে এই কাণ্ডটি। কিন্তু সে আশা যে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথা অনুভব করবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত যেন পাথরে পরিণত হয়ে গেলেন।

আরও সংবাদ এল। প্রত্যুষের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে পথে রক্তের দাগ আবিষ্কৃত হল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নদী পর্যন্ত নেমে গেছে। বেলাভূমির ওপরে সোমনাথের একখানা নোটবই পাওয়া গেল। বোধ হয় বুকপকেট থেকে পড়ে গিছল।

বইটা উল্টে পাল্টে দেখলেন পণ্ডিত। তারো একদিকের মলাটে রক্তের দাগ।

—সর্বনাশ!—শিউরে উঠলেন তিনি। তাদের খুন ক'রে নদীতে ফেলে দিলে নাকি?

—শশী?

—বলুন, পণ্ডিত দাদা।

—যতগুলো নৌকো পারো নদীতে নামাও। জেলেপাড়ায় খবর দাও এখনি। আর জিজ্ঞাসা করে এসো, গত কাল জেলেদের কেউ নৌকো নিয়ে হাঁসখালি গেছে কিনা?

—হাঁসখালি একেবারে ধাত্রী আর সমুদ্রের মোহনায়। যদি তাদের হত্যা ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়াই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের দেহ প্রবল স্রোতের টানে, সমুদ্রের দিকেই ভেসে যাবে, সে আশঙ্কা পণ্ডিত গোপন করতে পারলেন না। গৃহ-প্রত্যাগমনরত জেলেরা তাদের ভাসমান দেহ লক্ষ করলেও করতে পারে।

দু একখানা নৌকো এখান থেকে রোজই হাঁসখালি যায়। সেখানে প্রকাণ্ড হাট বসে।

শশী ছুটল জেলেপাড়ায়।

ভাবতে বসলেন পণ্ডিত। রাত্রির অন্ধকারে তাদের দেহ যদি জেলেদের চোখে না পড়ে কিংবা সে দেহ যদি হাঙ্গরের ভক্ষই হয়ে থাকে?

আর সামলাতে পারলেন না প্রৌঢ়। দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

দেবী! বড় আদরের, বড় যত্নের বোনটি। পাতানো বোন কিন্তু রক্তের সম্পর্কের অধিক।

শুধু কি তাই? পবিত্র বস্তুর মত তাকে তিনি রক্ষা করে আসছেন। সে তাঁর অমূল্য সঞ্চয়। তাঁর গুরুদেবের গচ্ছিত ধন।

তাকে রক্ষা করতে গুরুর কাছে তিনি প্রতিশ্রুত।

এখনো তাঁর কাণে গুরুর কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, অক্ষয়, এর যাবতীয় দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। নিতে হবে এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার। পবিত্র সম্পদের মত তুমি একে রক্ষা করবে। যেদিন আমি ফিরে এসে এই গচ্ছিত সম্পদ ফেরৎ চাইব, সেদিন আমাকেই আবার দেবে ফিরিয়ে।

—যে আজ্ঞা গুরুদেব। এ কে?

—তোমার গুরুবোন। এক মহান কার্যের জন্য উদ্দিষ্টা। সেই কার্যের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য আমি একে এখানে রেখে যাচ্ছি। সময়

হ'লেই আবার নিয়ে যাব। ওর কাজ এখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ক্ষেত্রান্তরে হবে ওর বিকাশ। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত ওকে এখানেই সাধনা করতে হবে। আর তুমি করবে ওকে সাহায্য।

—সর্বান্তঃকরণে।

—মনে রেখো মেয়েটি ফুলের মতই পবিত্র, কিন্তু ওর জন্মবৃত্তান্ত অন্ধকারে ঢাকা। চরম লাঞ্ছনা থেকে আমি ওকে উদ্ধার ক'রে এনেছি, দীক্ষা দিয়েছি নিজে আগ্রহ ক'রে। সেই দীক্ষার বীজ এখানেই অঙ্কুরিত হবে। সে অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত করবার ভার তোমার ওপর।

—আমার ওপর ?

—হ্যাঁ। তার কারণ তোমার আর ওর ইষ্ট এক। একথাও তোমাকে কর্তব্যবোধে প্রকাশ ক'রে বললুম।

—আপনার কৃপা।

—ও নিজেই অগ্রসর হবে ওর বিকাশের পথে। তুমি শুধু ওকে সাহায্য করবে।

—আপনার আদেশ পালন করব।

এরপর গুরুদেব প্রকাশ করেছেন পণ্ডিতের কাছে গৌরীর জন্মবৃত্তান্ত। সেই ইতিহাস মৌন বেদনায় পণ্ডিতকে করে তুলেছে বিষণ্ণ। আবার তার কার্যকলাপের কাহিনী শুনে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ।

গুরুদেবই বলে দিয়েছিলেন, এর নাম গৌরী হ'লেও ডাকবে একে দেবী বলে।

গুরুর নির্দেশ পণ্ডিত পালন ক'রে এসেছেন অক্ষরে অক্ষরে।

তাঁকে তাঁর গুরু বহুদিন আগে দীক্ষার সময় বলেছিলেন, মনে রেখো যাই করো না কেন, তোমার প্রত্যেকটি কাজ হবে 'জগদ্ধিতায়'। আমাদের ধর্মের এই মূল কথা। এই কথা ভুলেই আমাদের আজ

এই দারুণ অধঃপতন। আমরা আত্মকেন্দ্রিক নয়, স্বার্থসর্বস্বও নয়, আমাদের জীবন বহুদিন আগেই উৎসর্গ করা হয়েছে জগতের কল্যাণের জন্য। প্রত্যেকটি জীবের মঙ্গল কামনা, প্রতিটি বস্তুর পূর্ণ বিকাশের প্রার্থনা আমাদের প্রথম করণীয় কাজ।

শিরোধার্য করলেন পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সেই উপদেশ। 'জগদ্ধিতায়' এই মন্ত্রকে সজীব ক'রে তোলবার সাধনা সুরু হ'ল।

বিখ্যাত বংশে জন্ম তাঁর। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু-বিস্তৃত। প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান তিনি।

আরম্ভ করলেন কাজ।

যথাসবস্বের বিনিময়ে স্কুল বাড়ী তৈরী হ'ল। শিক্ষার প্রয়োজন সর্বপ্রথমে। যাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর আত্মোৎসর্গ, তারা আগে জানুক কিসে তাদের মঙ্গল হবে। জমিদার বাড়ীর মাসিক বৃত্তিই রইল সম্বল। কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ! তাই হ'লেই যথেষ্ট।

অক্ষয় পণ্ডিতের খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি দার পরিগ্রহ করলেন না। নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ ক'রে দিলেন জনসাধারণের সেবায়। বিপদে-আপদে সমস্যায়-সঙ্কটে লোকে ছুটে আসতে লাগল তাঁর কাছে।

এমন সময় গৌরীকে নিয়ে এলেন গুরুদেব।

তার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু অবগত হলেন পণ্ডিত। তাকে সযত্নে দিলেন আশ্রয়। তাঁর স্নেহে গৌরী হয়ে উঠল ধন্যা।

গৌরীও তাঁকে দিলে অনেক কিছু।

'ধর্ম লোক হিতে' একথা বলেছিলেন গুরু। মানুষের জন্য প্রাণপাত করবার সংকল্প নিয়ে আর শিক্ষাবিস্তারের কাজে অগ্রসর হয়ে তিনিও সুরু করেছিলেন তাঁর লোকহিতকর কার্য্য।

সেই কার্যে গৌরী এনে দিল বিশাল বিস্তৃতি। গ্রাম গঠনের স্বপ্ন সে

রচনা করলে পণ্ডিতের চোখে। সেই স্বপ্ন দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মনে পড়ল গুরুবাক্য, 'ও নিজেই অগ্রসর হবে ওর বিকাশের পথে। তুমি শুধু ওকে সাহায্য করবে।'

সাহায্যই করতে লাগলেন পণ্ডিত। প্রাণপণ সাহায্য।

সেই সাহায্য আজ পরিণতির পথে। গৌরীর প্রচেষ্টা লাভ করেছে একটা স্পষ্ট স্বীকৃতি। লোকহিতের অঙ্গীকার তাঁর আর গৌরীর একমাত্র আদর্শ।

আদর্শ পালনের পথে দেখা দিয়েছে সংঘাতের প্রশ্ন, তাতে তাঁর দ্বিধা নেই। পথ দুর্গম ও ক্ষুরধার। সেই পথেই চলতে হবে। কিন্তু গৌরী কোথা? তাঁর দেবী কোথা গেল?

চোখ বুজলেন পণ্ডিত। একান্তমনে ডাকতে লাগলেন গুরুদেবকে?

দৌড়ে এল শশী। হাঁফাচ্ছে।

—সোমনাথবাবুকে পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে?—লাফিয়ে উঠলেন পণ্ডিত, কোথায় পাওয়া গেল? দেবী কোথা? প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন শশীকে।

—দেবীকে পাওয়া যায়নি।—শুষ্ক কণ্ঠে শশী বললে, সোমনাথবাবুর জ্ঞান নেই। তিনি আহত হয়েছেন। হাঁসখালি থেকে ফেরার পথে দুর্গা জেলে একজন মানুষকে নদীতে ভেসে যেতে দেখে সন্দেহবশত পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় লোকটি মৃত নয় এই সিদ্ধান্ত করেই তাঁকে নৌকায় তুলে এনেছে। এর বেশী আর কোন সংবাদ আমি জানি না।

শশীর কথা শেষ হ'তে না হতেই বাইরে অনেক লোকের কণ্ঠ শোনা গেল। পরক্ষণে জনার্দন এবং আরো কয়েকজন ধরাধরি করে নিয়ে এল অচৈতন্য সোমনাথের দেহটাকে।

পণ্ডিতের গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে শশী বললে, সাতখানা নৌকো ছেড়েছে হাঁসখালির দিকে। সমুদ্র পর্যন্ত তারা যাবে, দেবীর দেহের

খোঁজে। অবশ্য খুব বেশী দেরী হয়ে গেছে। যদি সত্যি সত্যিই জলে ভেসে গিয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো আর খোঁজ পাওয়া যাবে না।—কথা বলতে বলতে শশীর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল। দুহাতে মুখ ঢেকে সে সেইখানেই বসে পড়ল।

পণ্ডিত দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দ গম্ভীর মুখে।

অন্ধকার রাত্রি। ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আকাশখানা কে যেন ঢেকে দিয়েছে মেঘের কালো চাদর দিয়ে। বিদ্যুতের ঝলমলে আলোয় এক একবার সেই চাদরখানা চিরে-চিরে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গুরু গুরু করে উঠছে মেঘ।

আকাশের চাদর থেকে পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে তরল কালিমা। সৃষ্টির হৃদস্পন্দন যেন চাপা পড়ে গেছে তমসার স্রোতের নীচে। অতলের গর্ভ থেকে যে বুদ্বুদ উঠে আসতে চাইছে ওপরে তার কোন প্রকাশ নেই।

একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ আর ব্যাঙের ডাক বনশ্রীকে করে তুলেছে মুখর। রাত্রি বেশী নয় কিন্তু মানুষগুলি বোধ হয় বিরক্ত হয়েই যে যার বাড়ীর আলো নিভিয়েছে। শুধু অনেকগুলো আলো জ্বলছে পণ্ডিতের বাড়ীতে।

এই দুর্যোগের রাত্রিতেও সেখানে অনেক লোকের ভীড়। তাদের উদ্বিগ্নমুখে স্পষ্ট একটা জিজ্ঞাসা।

সোমনাথের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে জানতে পেরেছে যে, পথ থেকে কতকগুলি লোক জোর ক'রে গৌরীকে ধ'রে নিয়ে গেছে। এ কাজ যে জমিদারের সে সম্বন্ধে কারো মনে আর সন্দেহ নেই।

সেই অন্ধকারেও তদের মুখের কাঠিন্যকে অনুভব করা যায়। অন্তরের অবরুদ্ধ ক্রোধ নিয়ে তারা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে পণ্ডিতের দিকে।

পণ্ডিত নিশ্চল। সোমনথের মাথার শিয়রে বসে আছেন।

হঠাৎ সকলকে সচকিত করে ঘরে এসে ঢুকল অবগুণ্ঠনবতী এক নারী।

—কে?—প্রশ্ন করলে শশী। সে দরজার কাছেই ছিল।

সে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলে, কিন্তু শশীর কথার কোন উত্তর দিলে না। তার দিকে চেয়ে ঘরের সকলেই যেন একটা বিজাতীয় ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। তীব্র কণ্ঠে শশী বললে, তুমি এখানে কেন?

স্ত্রীলোকটির সিক্ত বস্ত্র থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝরে পড়ছিল। বহুদূর পথ অতিক্রম করে সে আসছে, তাকে দেখলেই তা বোঝা যায়। সে শুধু বললে, পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দরকার আছে।

—পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে তোমার আবার কিসের দরকার?—এবার তাকে ধমক দিলে শশী। মেয়েটি শঙ্কিত হয়ে উঠল সেই ধমকে।

বয়স তার যৌবন সীমা পার হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রী ও স্বাস্থ্যের দীপ্তি দেহে এখনো বিদ্যমান। মুখে আর চোখে এমনই একটা নির্লজ্জ ও

অস্বাভাবিক ভাব যা সচরাচর ভদ্রনারীদের মধ্যে দেখা যায় না।

সমবেত লোকগুলির মধ্যে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন উঠছিল মেয়েটিকে কেন্দ্র ক'রে। তাকে দেখে তাদের অসন্তোষ যেন আরো বেড়ে গেছে।

মেয়েটিও এখানে এসেছে উত্তেজনার বশে। কিন্তু বিরূপ পরিবেশ আর বিক্ষুব্ধ মানুষগুলিকে দেখে সে কি করবে তার কিছু ঠিক করতে পারছিল না।

পণ্ডিত তাকে সম্বোধন করে বললেন, কি হয়েছে লিচু ? কি দরকার আমার সঙ্গে ?

লিচু যেন সাহস পেলে। বললে, বাইরে আসবেন ? সকলের সামনে সে কথা বলা চলবে না।

বিখ্যাত নাম লিচু। জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর অনুগৃহীতা বারাঙ্গনা। এক সময়ে সে ছিল তাঁর রক্ষিতা। এখন বয়স প'ড়ে যাওয়ার পর থেকে জমিদারবাবুকে মেয়ে যুগিয়ে দেয়। তাঁর অনুগ্রহে মস্ত বড়ো বাড়ী করেছে সে স্বরূপনগরের বাজারের কাছে। অর্থ ও অলঙ্কারের সঞ্চয়ও কম নয়।

সকলেই চেনে তাকে। সেও কোনদিন আত্মপরিচয় গোপন করবার চেষ্টা করেনি। সবার সমক্ষে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়িয়েছে। সকলের ঘৃণা কুড়িয়েছে কিন্তু কাকেও গ্রাহ্য করেনি। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে সসঙ্কোচে কোথাও এসে প্রকাশ করা তার জীবনে এই প্রথম।

সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠল। পণ্ডিতের সঙ্গে লিচুর গোপন কথা কি আবার আছে ? গৌরীর সম্বন্ধে কোন সংবাদ কি ? কিন্তু সে সংবাদ লিচু বয়ে আনবে অত দূর থেকে এই দুর্যোগের রাত্রিতে ? এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে ? জমিদারের পাপ কাজের সেই তো সাহায্যকারিণী ? তা নয়, এ বোধ হয় আর একটা চক্রান্ত।

শশী তো স্পষ্টই বললে, শুনবেন না পণ্ডিতদাদা, ওর কোন কথা। কি মতলবে ও এখানে এসেছে তা কে জানে! আমি ব্যবস্থা করছি, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে যাতে এখনি ওকে গাঁ থেকে বার করে দেওয়া হয়।

—কি বলতে চায় ও তা শুনতে দোষ কি?—বলতে বলতে পণ্ডিত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন লিচুকে নিয়ে। তার দিকে চেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সে ভয় পেয়েছে। মৃদু হেসে তাকে অভয় দিয়ে বললেন, যখন আমার কাছে এসেছ তখন ভয় কি? যে যাই বলুক, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, কোন ক্ষতি তোমার হবে না। যা শুনলে এটুকুও হয়তো শুনতে হ'ত না। কিন্তু তুমি জাননা, এরা কি ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে আছে।

—আমি জানি।—লিচু বললে, সেই জন্যেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার সময় নেই, আমাকে এখনি ফিরতে হবে। গোপনে এসেছি, লোক জানাজানি হলে সব ভেস্তে যাবে।

—এখনি যাবে? তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ যে?

—না গিয়ে উপায় নেই। এত পথ চলা অভ্যাস ছিল না, পা কেটে রক্ত পড়ছে। তবু আমাকে যেতেই হবে। না হ'লে দেবীর সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—দেবীর সর্বনাশ হয়ে যাবে? কথাটার পুনরাবৃত্তি করে লিচুর একখানা হাত জোরে চেপে ধরলেন পণ্ডিত। উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় অকস্মাৎ তাঁর মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

—কি বলবে শীগগীর বলো?—পণ্ডিত বললেন।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে লিচু। বললে, আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন না তো? এখানকার কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সে কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দোহাই আপনার, আজ যদি

আমাকে অবিশ্বাস করেন তো দেবীকে আর পাবেন না।

পণ্ডিত অন্তরে অন্তরে অধীর হয়ে উঠছিলেন। তবু শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি তোমাকে তিলমাত্র অবিশ্বাস করিনি। কি বলতে চাও তুমি বলো। আর দেরী করো না।

লিচু আর দ্বিধা করলে না। বললে, আগের কথা বলব না। ব'লে লাভও নেই, আর বিশেষ কিছু জানিও না। চৌধুরীমশায়ের নায়েব এককড়ি দেবীকে নিয়ে গিয়ে তুলেছে আমার ওখানে। ওদের পরামর্শ হয়েছে তাকে স্বরূপনগরে রাখবে না। কারণ হৈ হৈ একটা হবেই। আজ শেষরাত্রিতে তাকে নিয়ে ওরা কলকাতা যাবে। সেখানে গিয়ে উঠবে চৌধুরীমশায়ের দম্‌দমার বাগান-বাড়ীতে। পথে যে ক'রে হোক দেবীকে আপনারা উদ্ধার করুন।

পণ্ডিত স্তব্ধ হয়েছিলেন। লিচু আবার বললে, রেলে যাওয়া হবে না। নদীতে বজরা তৈরী হয়ে আছে। শেষরাত্রিতে তাকে ঢাকা পাল্কীতে করে বজরায় নিয়ে যাওয়া হবে।

—চৌধুরীমশাই কোথা?—পণ্ডিত বললেন।

—এখানেই আছেন। তিনি যাবেন কাল।

—অর্থাৎ দেবীকে নিয়ে বজরা চলে যাওয়ার পর, নিশ্চিন্ত হয়ে?—পণ্ডিত বললেন।

—হ্যাঁ! আমি আর দেরী করব না।—লিচু বললে, যে রকম ক'রে পারেন আপনি সব ব্যবস্থা করুন। এ সুযোগ ফস্‌কে গেলে বোধ হয় আর সুযোগ পাবেন না। আমার কাজ এখানেই শেষ। এরপর আর আমার কোন সাহায্য পাবেন না। কিন্তু দেখবেন, আমার নাম যেন না প্রকাশ হয়।

—না, তা হবে না।—পণ্ডিত বললেন, দেবী কি কান্নাকাটি করছে?

—না। হাসছে আর বলছে চৌধুরীমশায় কোথা? নিয়ে এস না

তাঁকে আমার কাছে। তবে কাল থেকে নিরম্বু উপবাসী আছে। জলগ্রহণও করেনি।

—হুঁ!—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন পণ্ডিত। বললেন, চৌধুরী-মশায়ের সঙ্গে তাহলে তার দেখা সাক্ষাৎ এখনো হয়নি?

—কলকাতা না যাওয়া পর্যন্ত হবে না।—লিচু বললে, আমি আর দেরী করব না পণ্ডিতমশাই। যা ব্যবস্থা করবার আপনি করবেন।

—হ্যাঁ।—পণ্ডিত বললেন, তুমি যাও, দেখি ভগবানের কি ইচ্ছা। তোমার সঙ্গে কি লোক দোব?

—না। আমি একলাই যাব।

—তাহলে যাও লিচু। তোমার কাছে শুধু আমি নয়, পনেরোখানা গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

আবার কেঁদে ফেললে লিচু। বললে, ওকথা বলে আমার পাপের বোঝা আর বাড়াবেন না। আজীবন পাপ করেছি। বহু মেয়ের সর্বনাশের মূল আমি। কিন্তু দেবীর সর্বনাশের উপলক্ষ হতে কিছুতেই পারব না।

—দেবীর সর্বনাশ করবার সাধ্য কারো, এমনকি রায়চৌধুরীরও নেই লিচু। যাই হোক, দেবীকে নিমিত্ত ক'রে তোমার বিবেক যখন জেগেছে তখন এবার থেকে বিবেককেই অনুসরণ করো।

—কি হবে জানি না পণ্ডিতমশাই। বজরায় দেবীর সঙ্গে আমারও যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

—মাথা নীচু করে মাত্র এইটুকুই সে বললে। পণ্ডিতের মনে হল তার আরো কি যেন বলবার ছিল কিন্তু সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে সে কিছু প্রকাশ করতে পারছে না।

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, যদি সে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সহসা তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ত্রস্তপদে লিচু বেরিয়ে গেল।

পণ্ডিত গম্ভীর কণ্ঠে শশীকে ডাকলেন। নিম্নস্বরে তাকে সব কথা জানিয়ে বললেন, রাজার গাঁয়ের বাগ্দীদের এখনি খবর দাও। জনকতক ভালো লেঠেল চাই।

—কিন্তু এ চৌধুরীর আর একটা চাল নয় তো?—শশী বললে।

পণ্ডিত বললেন দৃঢ় কণ্ঠে, না, লিচুকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।

সেখানকার আরো কয়েকজনের সঙ্গে শশী পরামর্শ করলে ফিস্‌ফিস করে। তারপর জনার্দনকে ডেকে বললে, ওস্তাদ, খেলা দেখাতে পারবে তো?

—কেন, বুড়ো হয়েছি বলে? বলো না, এককড়ি নায়েবের মাথাটাই আজ নিয়ে আসছি।—হা হা করে হেসে উঠল জনার্দন।

—না না। ওকাজ করতে যেও না।—বাধা দিলেন পণ্ডিত, খুনজখম্ যেন না হয়। বুঝতে পারছি দাঙ্গা একটা হবেই। কিন্তু যতটা পারো সম্‌ঝে চলবে।

—দাঙ্গা করতে গিয়ে কি আর বোষ্টম হওয়া যায় ঠাকুর?—আবার হাসল জনার্দন, রক্তারক্তি না হলে আর দাঙ্গা হ'ল কি? আপনি ঘরে চুপচাপ বসে থাকুন না। দেবীর খোঁজ যখন পেয়েছি, তখন দু'শ লোকের মওড়া এই বুড়ো হাড়ে আমি একলাই নোব।

—আর দেরী নয় শশী।—পণ্ডিত এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, রাজার গাঁ থেকে লেঠেল নিয়ে স্বরূপনগর যেতে সময়ও লাগবে ত? তার ওপর বর্ষাবাদলের রাত।

—দেরী আমি একদম করিনি পণ্ডিতদাদা। আর রাতটা আমাদের কাজ উদ্ধারের পক্ষেও অনুকূল। এবার আমি বেরিয়ে পড়ি।

চলো ওস্তাদ!—জনার্দনের হাত ধরলে শশী।

—আশীর্বাদ করো ঠাকুর, জমিদারের বিসর্জনের বাজনাটা একবার বাজিয়ে দিয়ে আসি। রণপায়ে যাবো, ভাবছ কেন?

মাথায় গামছা বেঁধে বেরিয়ে পড়ল জনার্দন। উৎসাহে সে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়িয়েছে। বাঘ যেন পেয়েছে শিকারের গন্ধ।

তাদের যাত্রা পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পণ্ডিত। তারপর এক সময় আত্মগত ভাবে বলে উঠলেন, ভগবান!

ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্, বৃষ্টিধারা ঝ'রে পড়তে লাগ্‌ল।

দেখে বন্দিনী বলে মনে হয় না। রায়চৌধুরী চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন গৌরীর জন্য। দোতলার চিলে কোঠার ঘরখানি যেন বিশেষ করে তারই জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একজন মানুষের বাস করবার পক্ষে যা যা প্রয়োজন তার কোনটিরই অভাব নেই এখানে। এমন কি টেবিলের ওপরে খান দুই তিন হাল্‌কা ধরনের উপন্যাসও রয়েছে। বোধ করি সময় কাটানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। রায়চৌধুরীর রুচী আছে বলতে হবে। ক্ষণস্থায়ী বন্দীদশার মধ্যেও তিনি আনতে চেয়েছেন বৈচিত্র।

পালঙ্কে নয়, মেঝেয় বসে আছে গৌরী। মুখ দেখে তাকে বিক্ষুব্ধ বলে বোধ হয়, কিন্তু তার মধ্যে চঞ্চলতা নেই। পাথরের মূর্তির মতো সে এমনি ভাবে স্থির হয়ে আছে যে হঠাৎ দেখলে তাকে ধ্যানরতা বলে মনে হয়।

ভাবছিল গৌরী।

স্মৃতির আকাশে নক্ষত্রের ফুল ফুটছে একটি দুটি করে। অন্ধকারের গর্ভ থেকে উৎসারিত সেই জ্যোতি-স্ফুলিঙ্গেরা তন্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে। দূরে, বহুদূরে দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ। অনন্ত শূন্যতার মৌন ও গম্ভীর পরিবেশে তারা একসঙ্গে বিকীরণ করছে আলো আর উত্তাপ।

সেই অখণ্ড স্তব্ধতায় ধ্বনিত হয়ে উঠল একটি উদাত্ত কণ্ঠ : "তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

কতোই বা তখন গৌরীর বয়স। সাত বোধ হয়। অস্পষ্ট মনে পড়ে কাহু পিসিমার বাড়ীতে গৈরিকধারী এক বিশালকায় পুরুষের আবির্ভাব। উজ্বল গৌরবর্ণ দেহ থেকে জ্যোতি যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখমণ্ডল। মুণ্ডিত মস্তকে একটি গেরুয়া রঙের টুপি

শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন কাহু পিসীমা। আনন্দে আত্মগত ভাবেই একবার বললেন, গুরুদেব?—তারপর তাড়াতাড়ি এসে প্রণাম করে পা ধুইয়ে দিলেন। বললেন, গৌরী প্রণাম কর।

প্রণাম করলে গৌরী কতকটা বিহ্বল ও বিভ্রান্ত ভাবে।

সন্ন্যাসীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল সে। স্পষ্ট মনে পড়ে, চেয়ে থাকতে ভালোও লাগছিল। যেন এক অপার আনন্দ তাঁর দীর্ঘায়ত তুই চক্ষুর ভিতর থেকে উপচে পড়ছিল। সেই আনন্দের স্পর্শ সঞ্চারিত হচ্ছিল গৌরীরও অন্তরে। অকস্মাৎ তার চিত্তে যেন একটা আলোড়ন সুরু হয়েছে যে আলোড়নের আবেগ ইতিপূর্ব্বে সে আর কথনো অনুভব করেনি।

সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে সে বসে রইল স্তম্ভিত ভাবে।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন হাসতে হাসতে, কি গো গৌরী, কেমন আছো?

তাঁর মুখে নিজের নাম শুনে তার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল কিনা সে কথা আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু এটুকু মনে পড়ে তাঁর প্রথম প্রশ্নের কোন উত্তর সে সেদিন দেয়নি। দিতে পারেনি। সাময়িক ভাবে সে যেন বাক্যহারা হয়ে গিছল।

কাহু পিসিমা বললেন, কথার উত্তর দাও। বলো, ভালো আছি।

তবু সে কথা কইতে পারলে না।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। কাদু পিসিমা হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন তাঁকে। ঘর্ম্মধারায় তিনি যেন স্নান করে উঠছিলেন।

হস্ত সংকেতে গৌরীকে কাছে ডাকলেন তিনি।

কাছে উঠে গেল গৌরী।

তাকে পাশে বসিয়ে তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, কথা কইতে লজ্জা হচ্ছে? আচ্ছা আর লজ্জা হবে না। এইবার কথা কও।

সত্যসত্যই নিমেষের মধ্যে কোথায় চলে গেল তার সঙ্কোচ। সে একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে কথা কইতে সুরু করলে তাঁর সঙ্গে। অকস্মাৎ এমন একজনকে সে যেন পেয়েছে যিনি তার একান্ত আত্মীয়। তার এই সাত বছরের জীবনে এমন আত্মীয়ের দেখা সে আর পায়নি।

সাত বছরের মেয়ের কথা। যুক্তিহীন জিজ্ঞাসা আর অর্থহীন কৌতূহল ছাড়া সে কথায় বুঝি আর কিছু ছিলো না। তবু তার সমস্ত কথার উত্তর তিনি দিচ্ছিলেন।

একসময় কাদু পিসিমা বললেন, আর ওঁকে বকাস্‌নি গৌরী।

—কেন, তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে?—তিনি বললেন হাসতে হাসতে।

লজ্জিত হলেন কাদুপিসিমা, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে না?

—একটুও না।—হাসলেন তিনি। বললেন, বিশ্রাম করতে আমি আসিনি কাদু। জীবনে বিশ্রাম করবার অবসরও বিশেষ পাইনি।

—আপনাকে বিরক্ত করছে।—সসঙ্কোচে বললেন কাদু পিসিমা।

—একটু বিরক্তিবোধ না হয় করতেই দিলে আমাকে?

আর কিছু বললেন না কাদু পিসিমা। মাথা নীচু করে তাঁর পা টিপ্‌তে লাগলেন।

তিনি আবার সুরু করলেন গৌরীর সঙ্গে কথা। যুক্তিহীন জিজ্ঞাসার, অর্থহীন কৌতূহলের অপরূপ উত্তর তিনি দিতে লাগলেন আশ্চর্যভাবে।

এই সাত বছরের জীবনে এমন সংসর্গ আর পায়নি গৌরী। সে উৎসাহিত হয়ে উঠল। এমন সংসর্গ কেন, এক কানু পিসিমা ছাড়া শৈশবে আর কারো স্নেহ ভালোবাসা পায়নি সে। জন্মাবধি সে নিজেকে পিতৃ-মাতৃহীনা বলেই জানত। কানু পিসিমা ছাড়া তার আপনার বলতে আর কেউ ছিল না।

অভাববোধ যে কখনো মনে জাগেনি তা নয় মাঝে মাঝে প্রশ্ন-কণ্টকিত হয়ে উঠেছে মন। পাড়ার যে সব ছেলে-মেয়েরা তার খেলার সাথী তাদের কত আত্মীয় আছে। বাবা, মা ছাড়াও কাকা, মামা, জ্যেঠা, দাদু, মাসী, পিসী, বৌদি, কাকীমা কত! তাঁদের কাছে তার সঙ্গী- সঙ্গীনীরা কত আবদার ক.র! কত আদর পায়!

কিন্তু সে অভাববোধ তীব্র হয়ে ওঠেনি। প্রশ্নের কণ্টক প্রবেশ করতে পারেনি মনের গভীরে। সাময়িক ভাবে নিজেকে স্নেহ-বঞ্চিত ভেবে হয়ত মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে কিন্তু সে ক্ষোভ মনের সমুদ্রোত্থিত আনন্দ-তরঙ্গে মিলিয়েও গেছে অবিলম্বে। তার বিষণ্ণ মুখ দেখেই কানু পিসিমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন।

অদ্ভুত সতর্ক দৃষ্টি কানু পিসিমার। তাঁরও এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এই আধা-সন্ন্যাসিনী আধা-সংসারী মানুষটি গৌরীকে নিয়েই আছেন। নিষ্ঠায় যেমন তিনি অবিচল, গৌরীর লালন পালনে তেমনি স্নেহ-পরায়না, কর্তব্য পালনেও তেমনি কঠিন।

দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটত জপ তপে আর গৌরীকে দেখা শোনায় তবু এরি মধ্যে সময় করে তিনি চরকা কাটতেন, গৌরীকে লেখাপড়া শেখাতেন। এ দুটি তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কাজ।

রান্না-বান্না, ঘর-সংসারের কাজ তাও করতেন নিজের হাতে। তাঁর ছোট্ট মাটির কুঁড়েখানি কখনো নোংরা হ'ত না। সর্বক্ষণ ঝকঝক তকৃতক্ করত।

আর একটি নিত্যকর্ম ছিল। সন্ধ্যার পর গৌরীকে নিয়ে বসে রামায়ন অথবা মহাভারত পড়া। এই সময়টিতে তাঁর কাছে বসে একাগ্র হয়ে গৌরীকে পাঠ শুনতে হ'ত।

শুনে শুনে গৌরীর রামায়ণ মহাভারতের অনেকখানি মুখস্ত হয়ে গিছল।

মুখস্ত করা অংশ কাদু পিসিমাকে আবৃত্তি করে সে শোনাত।

পিসিমার মুখ উঠত উজ্জল হয়ে। তিনি বলতেন, বেশ মা বেশ! শিখেনে এই বেলা সমস্ত। তোকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে হবে। এই জন্তই তো এত তাড়া দিই। যিনি তোকে এখানে রেখে গেছেন তিনি তোকে নিয়ে যেতে আসবার আগেই তুই যেন প্রস্তত হয়ে থাকতে পারিস।

—কে তিনি পিসিমা?—গৌরী কৌতূহলী হয়ে উঠত।

—তিনি একজন মহাপুরুষ।

—কোথায় যাবো তাঁর সঙ্গে?

—আমি তার কি জানি মা! তিনি তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। আমি সেই গচ্ছিত সম্পত্তি আগলে আছি। যখনি এসে চাইবেন, ফিরিয়ে দিতে হবে।—পিসিমা অন্ত দিকে মুখ ফেরাতেন।

—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না পিসিমা।—কাঁদো কাঁদো মুখে গৌরী বলেছিল।

চোখ মুছে, মুখ ফিরিয়ে ধরা গলায় পিসিমা বলেছিলেন, ছি মা, ও কথা কি বলতে আছে? তুমি যে তাঁরই জিনিষ। তাঁর আদেশে তুমি শুধু এখানে আছো।

গৌরী সে কথা শুনতে চায়নি। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তার বুকের ভিতর টন্‌টন্ করে উঠত। সে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমি যাবো না পিসিমা।

আত্মসম্বরণ করে পিসিমা তাকে শান্ত করতেন, আচ্ছারে! সে তখন দেখা যাবে। তিনি আগে আসুন তো, তারপরে দেখব কেমন না যাস্। তখন হয়তো এই পিসিমার কথা আর মনে থাকবে না।

—কখখনো না।—পিসিমার কোলে মুখটা গুঁজে সে প্রতিবাদ করত প্রবলভাবে।

তার চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে পিসিমাও কেমন যেন আন্‌মনা হয়ে যেতেন।

পিসিমা সারাদিন খুব ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

গুরুদেব অনেকদিন পরে এসেছেন। তাঁর সেবার সর্ববিধ আয়োজন করতে গিয়ে তাঁর আর নিশ্বাস ফেলবার অবসর রইল না। কিন্তু তিনি গম্ভীরও হয়ে উঠলেন অস্বাভাবিকভাবে। তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখে যেন নেমে এল বিষাদের পাণ্ডুর ছায়া। তাঁর বিষণ্ণ মুখশ্রীর দিকে চেয়ে গৌরীও বিস্মিত হল।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে পিসিমার কি কথা হয়েছিল গৌরী তা শোনেনি।

পিসিমার মুখ দেখে তার মনও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। অকস্মাৎ তার বুকের ভিতর যেন তোলপাড় করছে থেকে থেকে। একটা চাপা অস্ফুট কান্না যেন অন্তরের অর্গল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কিন্তু সে ভাব তার স্থায়ী হচ্ছিল না। বিষাদের করুণ ছায়ার পাশে পুলকোচ্ছল একটা সুরের অনুরণও সে শুনতে পাচ্ছিল। কান্না আর হাসি, আনন্দ আর বেদনা পাশাপাশি ফুটে উঠছিল তার চিত্তের তারে। সে অভিভূত হয়ে শুধু শুনছিল একটা সুরের ঝঙ্কার যা একই সঙ্গে আনন্দময় ও করুণ। অশ্রুতপূর্ব সেই সুর তার শিশু মনে সৃষ্টি

করছিল বিচিত্র একটা আবেগের। যে আবেগে তার সর্বদেহে জেগে উঠছিল রোমাঞ্চ।

গুরুদেব খেতে বসলেন। পিসিমা পাখার হাওয়া করছিলেন তাঁকে। একটু দূরে গৌরী চুপ করে বসেছিল।

হঠাৎ সে শুনতে পেলে গুরুদেব বলছেন, গৌরীকে কথাটা আমার সামনেই বলো।

সে লক্ষ করলে পিসিমার বিষণ্ণ মুখ ম্লাণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আচ্ছা।

গৌরী অবাক হয়ে গেল। কথাটা যে তারই সম্বন্ধে সেকথা সে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কি কথা? কৌতূহলী মনের এই জিজ্ঞাসার সম্মুখে হঠাৎ বিদ্যুত ঝলকের মতো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল উত্তর। মনে পড়লো পিসিমার কথা, "তিনি তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। আমি সেই গচ্ছিত সম্পত্তি আগ্‌লে আছি। যখনি এসে চাইবেন, ফিরিয়ে দিতে হবে।"

তিনি কি তাহলে আজই এলেন? একটা অসহ্য বেদনায় তার সারা শরীর যেন টন্‌টন্ করে উঠল। আর থাকতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে সে।

পিসিমা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

গৌরীর মনে পড়ে সেদিন তার অশ্রু বাধা মানেনি। স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরিণীর মতো সেই অশ্রুধারা উৎসারিত হয়ে উঠছিল মনের গভীর রহস্যের অতল থেকে। উদ্দাম ঝড়ে শান্ত সমুদ্র যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তার গর্জনে উত্তাল-তরঙ্গমালা ফেটে পড়ছে সফেণ হুঙ্কারে।

পিসিমার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনি তাকে শান্ত করতে পারলেন না। সে কান্নার আবেগ রোধ করা তাঁর সাধ্যের অতীত।

কোন অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অভিমান বুদ্ধি ও চৈতন্যের অজ্ঞাতসারে যে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনাকে সহ্য করে অটল স্তব্ধতায় নিঃশব্দে এতদিন প্রচ্ছন্ন হয়েছিল অবচেতনার অন্ধকারে, তার উৎসমুখ হঠাৎ যেন খুলে গেল। হু হু করে বেরিয়ে আসছিল বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনের স্তূপীকৃত গ্লানি। পাহাড়ের ভমানে বরফ সূর্যের উত্তাপে গলে গিয়ে নদীর জলধারায় সেদিন নিয়ে এসেছিল দুর্বার বন্যা

গুরুদেবের খাওয়া হ'ল না। তিনি উঠে এসে বসলেন গৌরীর পাশে।

লজ্জায় পিসিমা যেন মরমে মরে গেলেন। অস্ফুট স্বরে একবার শুধু বললেন, খাওয়া নষ্ট করে দিলি হতভাগী ?

—তা দিক :—গুরুদেব বললেন, এর-ওপর ওকে আর লজ্জা দিয়ো না। এই ধাক্কাই ওকে আগে সামলে নিতে দাও।

গৌরীর মাথায় নীরবে তিনি হাত বোলাতে লাগলেন আর তাঁর শান্ত ও জ্যোতির্ময় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল তার চোখের ওপর।

আজো গৌরীর মনে পড়ে কি গভীর আনন্দ আর অপার শান্তি তাকে স্পর্শ করছিল সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। তার সর্বাঙ্গের রক্তাক্ত ক্ষতস্থানগুলির জ্বালা যেন এক আশ্চর্য প্রলেপে শান্ত হয়ে আসছিল।

তখনো সে জানত না যে তার জীবনের উৎসমূলে আছে গ্লানির পঙ্ককুণ্ড। তার ভাগ্য যে তাকে নির্মম ভাবে বঞ্চনা করেছে সে কথা সে শুনেছে তার অনেকদিন পরে। কিন্তু এই কথা ভেবে সে আজো আশ্চর্য হয়ে যায়, কেমন করে শৈশবেই তার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিলো যে জীবনের ফুলটি তার সহজ ও সরল ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। জীবন-দেবতার নিষ্ঠুর পরিহাসে তার পরিবেশ পর্যন্ত যে বিষাক্ত হয়ে গেছে সে কথা অজ্ঞাত থাকলেও একটা

বেদনাবোধ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মত তার অন্তর আচ্ছন্ন করে থাকত সর্বক্ষণ।

কোথা থেকে এই অনুভূতি সে পেলে তার কিছুই সে জানে না।

আর কাঁদলে না গৌরী। সেই দিনই অপরাহ্নে গুরুদেব প্রস্তুত হলেন তাকে নিয়ে যাত্রা করবার জন্য।

যাওয়ার সময় উদ্গত অশ্রু প্রাণপণে দমন করে পিসিমা বললেন, আমি এবার কি করব?

—তোমার কাজ তো নির্দিষ্ট হয়েই আছে।—হাসলেন গুরুদেব।

পিসিমা প্রণাম করে বললেন রুদ্ধকণ্ঠে, একা থাকব কি করে?

—তুমি তো একা নও।—গুরুদেব বললেন, এক কে যে বহুভাবে দেখেছে আবার বহুকে করেছে এক, তুমি যে তাদেরি একজন। তোমার চিন্তা কিসের কাদু?

—আশীর্বাদ করুন।—পিসিমা বললেন।

আশীর্বাদ করছি শান্ত হও।—গুরুদেব বললেন, নতুন কাজের নির্দেশ দু একদিনের মধ্যেই তুমি পাবে।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। গৌরীর হাত ধরে নেমে পড়লেন পথে। তার জীবনের পশ্চাৎপটে কাদু পিসিমা অপসৃত হয়ে গেলেন।

সম্মুখে পদক্ষেপ করলে সে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

গৌরী এসে উঠল প্রকাণ্ড একটা মঠে।

আর এক জীবন। কঠিন নিয়মে দিনগুলি সীমাবদ্ধ। কঠোর শৃঙ্খলায় মুহূর্ত্তগুলি পরিমিত।

লেখাপড়া শিখছে গৌরী। বিকাশ তার শিক্ষক। তাকে সে এখানেই প্রথম দেখলে। সন্ন্যাসী কখনো থাকেন আবার কখনো চলে যান। কিন্তু বিকাশের আসা-যাওয়া নিয়মিত। অতি যত্নে সে গৌরীকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, নানা জাতির পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী. একজাতির প্রতি আর একজাতির অভিযান, সম্পদ ও রাজ্যের লোভে যুদ্ধ ও লুণ্ঠন, পর-রাজ্য গ্রাস, শাসন ও শোষণ সমস্তই বিকাশ তাকে পড়াচ্ছে।

অদ্ভুত শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি! গৌরীর আয়ত্ব করবার শক্তিও অসম্ভব।

ছাত্রীর জন্য বিকাশ গর্বিত।

ধীরে ধীরে গৌরী বড়ো হয়ে উঠল। কৈশোরের শেষে একদিন যৌবন এসে দেহে এঁকে দিয়ে গেল তার স্বাক্ষর।

প্রকাণ্ড মঠে একাকিনী সেই নিঃসঙ্গ তরুণী উদ্বেল চিত্তে ঘুরে বেড়াত।

সম্মুখে তার অজস্র প্রশ্ন। অনন্ত জিজ্ঞাসা।

মঠে আরো অনেক লোক ছিল। কিন্তু তার সঙ্গী কেউ নেই।

সেই নিঃসঙ্গ পরিবেশে গৌরীর জীবনে একটি বসন্ত আসত আর একটি বসন্ত বিলীন হয়ে যেত। নিয়মে বাঁধা দিন বয়ে যাচ্ছিল। সে হয়ে উঠল অধিকতর শৃঙ্খলাপরায়ণ।

স্বচ্ছন্দে ছিল সে। কখনো কখনো কানু পিসিমাকে মনে পড়ত। মনটা কেমন হয়ে যেত। ওই একজনের সঙ্গেই তার জীবনের যত কিছু পরিচয়। আর কেউ তো তার নেই।

তার একমাত্র দুঃখ নিঃসঙ্গতাবোধ। এ ছাড়া আর কোন অভাব তার ছিল না. সময় সময় নির্জনে সে হাঁফিয়ে উঠত। ইচ্ছা হত ভীড়ের মধ্যে ছুটে চলে যেতে। কোলাহলের মাঝখানে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে।

কিন্তু সে দুঃখও তার চলে গেল। গুরুদেব তাকে দীক্ষিত করলেন। দীক্ষার পূর্বমুহূর্তে সে তাঁর কাছ থেকে নিজের কথা জানতে পারলে। জেনে শিউরে উঠল। বিশ্ব হয়ে গেল অন্ধকার।

আঁস্তাকুড়ের ফুলও সেখানকার নোংরামি সহ্য করতে পারে না। সব শুনে তার গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল।

গুরুদেব বললেন উদাত্ত কণ্ঠে, "অসতো মা সদ্‌গময়"

সুরু হ'ল অসৎ পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে দুর্জ্ঞেয় মহতের এক দুর্বার অন্বেষণ।

নির্দিষ্ট কার্য্যক্রম নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে সে এল বনশ্রীতে অক্ষয় পণ্ডিতের বাড়ী।

গুরুদেব তাকে সেখানে রেখে যাওয়ার সময় বলে গেলেন,

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়োঃ বদন্তি"

তাঁকে প্রণাম করলে গৌরী।

এই তো তার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। আঁস্তাকুড়ের ফুলকে গুরুদেব করে তুলতে চান পূজার ফুল। তা কি হয়? তার মনে সন্দেহ জেগে উঠছে।

যদি তাই হবে তবে রায়-চৌধুরীর আঁস্তাকুড়ে সে আবার এসে পড়লো কেন? যে জীবন-দেবতার নিষ্ঠুর পরিহাস চিহ্ন ললাটে এঁকে সে এই পৃথিবীতে এল সেই জীবন-দেবতাই আবার তার হাত ধরে পৌছে দিয়ে গেলেন এই ঘৃণিত নরকে। সোমনাথের মত দেবদূতকেও হয়তো তার জন্য মৃত্যু-বরণ করতে হয়েছে।

সোমনাথের মাথায় লাঠি পড়বার সময় সে দেখতে পেয়েছিল। লোকগুলো তখন তাকে বাঁধবার চেষ্টা করছে। সোমনাথকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার দৃশ্যও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সোমনাথের কথা সে একাধিকবার বিকাশের কাছে শুনেছে। এই মানুষটির জীবনও আর এক ধরণের বঞ্চনার ইতিহাস। ভগীরথ হয়ে যে নদীকে সে মর্তে অবতরণ করালে সেই নদীই শেষ পর্যন্ত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অকূলে। বিকাশের কাছে সব শুনে তার প্রতি সহানুভূতিতে গৌরীর বুক ভরে উঠেছে।

মাঝে মাঝে গৌরীর মনে হয়, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জীবনই বঞ্চনার কাহিনী। বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ শুধু বঞ্চিত হয়েই রয়ে গেল। সার্থকতার স্পর্শ কেউ পেলে না।

কিন্তু সোমনাথের কি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা। কি দুর্জয় দৃঢ়তা। জীবনে অতোখানি আঘাত পাওয়ার পরেও সে আবার উঠে

দাঁড়িয়েছে? ভগীরথের আদর্শ থেকে সে বিচ্যুত হয়নি। গঙ্গাবতরণ আবার হবে।

এই তো মানুষের সত্যকার পরিচয়। বঞ্চিত মানুষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসে না। সে যোদ্ধা এই স্বাক্ষর এঁকে দিয়ে যায় ক্ষণকালের ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ হুঙ্কারে। এইখানেই সে অমর।

রায়-চৌধুরীর বন্দিনী হয়ে সে নিজের জন্য বিশেষ বিচলিত হয়নি। তার সমস্ত দুশ্চিন্তা সোমনাথের জন্য। মাথায় লাঠি মেরে মানুষকে নদীতে ফেলে দিলে কি সে মানুষ আর বাঁচে? যদি সোমনাথ বেঁচে না থাকে? কথাটা ভাবতে গিয়েও তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সেই দায়িত্ব সে কি ক'রে পরিহার করবে?

নিজের জন্য সে ভাবছে না। আঁস্তাকুড়ের ফুল পূজার ফুল না হয় নাই হ'ল, তাবলে পুষ্প জন্মকে সে অস্বীকার করবে কেন? ফুল ফুলই, তা ছাড়া আর কিছু নয়। রায়-চৌধুরীর সে কথা জানা উচিত। না জানলেও সেকথা সে তাকে শিখিয়ে দেবে।

উদ্দেশে হাত যোড় করে সেই হাত কপালে ঠেকিয়ে গৌরী মনে মনে বললে, জয় গুরু।

প্রাইভেট চেম্বারে বসেছিলেন রায়চৌধুরী।

ত্রস্তপদে এসে ঢুকলেন ধাড়া।

—কি কেলেঙ্কারী করলেন বলুন ত?—উত্তেজিত কণ্ঠে ধাড়া বললেন, সব মাটি করে দিলেন? দু'দিন আর সবুর সইল না?—পই পই করে আমি আপনাকে ব'লে আসছি, আস্তে আস্তে এগোন। কি প্রয়োজন ছিল আপনার দেবীকে অপহরণ করে আনবার?

রায়চৌধুরী বিমর্ষ। বললেন, Hasty decision নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাটাদের কি স্পর্ধা? আমার বজরা থেকে দেবীকে লুটে নিয়ে গেল?

—দু'দিন পরে ওই দেবীকে আমি আপনার হাতের মধ্যেই এনে দিতুম।—ধাড়া বললেন, সব দিকে জাল ফেলে আমি আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনছিলুম। কোন দিকে ত্রুটি ছিল না। আপনি সব নষ্ট করে দিলেন। আমি কোথা ইন্‌ফরমার দিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক প্রজাকে বলে পাঠাচ্ছি যে গ্রামোন্নয়ন, বাঁধ দেওয়া যে কাজই তারা করুক, তারা যেন জমিদারের কাছে আগে আসে। জমিদার তাদের সাহায্য করবেন। আমার উদ্দেশ্য দেবীর প্রভাব তাদের মন থেকে

মুছে দেওয়া। আর আপনি এগিয়ে গেলেন একেবারে আমার উদ্দেশ্যের উল্‌টো দিকে? মাফ্‌ করবেন মিঃ রায়চৌধুরী, অত্যন্ত নির্বোধের মত কাজ করেছেন আপনি।

নির্বোধ! একবার চমকে উঠলেন রায়চৌধুরী। চোখ দুটো আরক্ত হয়েও উঠল। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে নির্বোধ বলবার সাহস এ পর্যন্ত কারো হয়নি। কিন্তু আত্মসম্বরণ করতেও হ'ল। অনেক ব্যাপারে তিনি ধাড়ার হাতের ভিতরে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি বললেন, আমি ভুল করেছি মিঃ ধাড়া।

—আমার কি আফ্‌শোষ হচ্ছে তা জানেন?—ধাড়ার উত্তেজনা তখনো নিভে আসেনি। তিনি বলতে লাগলেন, যাকে আপনার প্রজারা শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তাকে কিনা আপনি আনলেন অপহরণ ক'রে? সোমনাথ বলে সেই বিপ্লবীটার মাথা ফাটিয়ে আপনার নায়েব তাকে দিলে নদীর জলে ভাসিয়ে? ভাগ্যের জোরে সেও বেঁচে গেল। এর পর প্রজারা আপনাকে কি নজরে দেখবে বলুন তো?

ধাড়ার কথা যুক্তিযুক্ত। রায়চৌধুরী যেন বোবা হয়ে গেছেন।

ধাড়া বললেন, এই নিয়ে গ্রামগুলোতে হৈ হৈ ত হয়েছেই, স্বরূপ-নগরেও টি টি হয়ে গেছে। আমার বাড়ীতে পর্যন্ত হাঙ্গামের সৃষ্টি হয়েছে। 'দেবীর খোঁজ করো, দেবীর খোঁজ করো' এই ক'রে মিসেস্ ধাড়া আমাকে কাল রাত্রিতে ঘুমতেও দেন্‌নি। এর পরের ঘটনাও সকলে শুনবে। কথা চাপা থাকবে না। মিসেস্ ধাড়া জানেন, আপনি আমার বন্ধু। আমি কি ক'রে মুখ দেখাব বলুন তো?

—ও কথা বাদ দিন মিঃ ধাড়া।—রায়চৌধুরী বললেন, গোখ্‌রো সাপের লেজে পা দিলে যা হয়, আমার অবস্থা এখন তাই। বজরা থেকে দেবীকে লুটে নিয়ে গেছে এ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত আমি যে কি মর্মপীড়া

ভোগ করছি, সে আমিই জানি। এর ওপর কাটা ঘায়ে আর নুণের ছিটে দেবেন না।

ধাড়া বোধ হয় একটু লজ্জিত হলেন। বললেন, ক্ষমা করবেন আপনি জানেন না, আমার মর্মদাহও কম নয়। আমার সমস্ত plan upset হয়ে গেল। যদি অসঙ্গত কথা বলে থাকি তো মানসিক উত্তেজনা বশেই বলেছি। আমি এখন কি করব তাই ঠিক করতে পারছি না। ওপক্ষের তোড়জোড়ও চলছে পুরাদস্তুর ভাবে। যদি সেকথা আপনি শোনেন তো অবাক হয়ে যাবেন।

—কি কি ?—উৎসুক হয়ে উঠলেন রায়চৌধুরী।

—সেদিনের একশচুয়াল্লিশধারা জারী হওয়ার কথা, প্রজারা গ্রামোন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে তাতে জমিদারের বাধা দেওয়ার কথা ওরা ফলাও করে কলকাতার খবরের কাগজগুলোতে ছাপিয়েছে। এই নিয়ে বিধান সভায় বিরোধীপক্ষ একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টাও করছে। সবচেয়ে গুরুতর কথা এই, হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে তলব করা হয়েছে।

—সর্বনাশ !—উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন রায়চৌধুরী।

—সর্বনাশের এখনো কিছু হয়নি।—হেসে উঠলেন ধাড়া, আগেই তো আপনাকে বলেছি, আমার সরকার জমিদারদেরও সুনজরে দেখেন না। প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্যে তাঁরা সব কিছু করতে রাজী। মুস্কিল হয়েছে এইখানে। কিন্তু সব মুস্কিলেরই আসান্ আছে। আপনার গুরুতর অপরাধও ঢাকিয়ে নিতে পারব, যদি এই ব্যাপারটাকে কম্যুনিষ্টদের একটা মুভমেণ্ট বলে চালিয়ে দিতে পারি। বন্ধুত্ব যখন করেছি, তখন আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন মিঃ রায়চৌধুরী। বিপদে এবং উৎসবে সবসময়েই আমি আপনার পাশে থাকব। শুধু একটি অনুরোধ, আপনার পক্ষ থেকে যেন হঠকারিতা না করা হয়।

—আর হবে না মিঃ ধাড়া। কথা দিচ্ছি।

—কথা আরো একবার দিয়েছিলেন।

—আঃ!—রায়চৌধুরী বিরক্ত হতে গিয়েও হলেন না। তাঁর মুখের ভাব যেন এইরকম হ'ল, সে কথা দেওয়া আর এ কথা দেওয়ায় অনেক প্রভেদ।

ধাড়াও বুঝলেন তাঁর মনের কথা। বললেন, আচ্ছা! আচ্ছা! ঠিক আছে।

উঠে পড়লেন তিনি। বললেন, আজই আমি কলকাতা যাচ্ছি। ওদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক করে আসব। ইতিমধ্যে আপনি চোখ-কান খুলে থাকবেন। যদি ওরা বাঁধ দেওয়ার কাজ আরম্ভ করে, আর আপনার খাস বনের ভিতর কিছু করতে যায় তো, সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবেন। আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরব।

কি একটা ইঙ্গিত করলেন তিনি। সে ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে রায়চৌধুরীর দেরী হ'ল না। তাঁর মুখে ফুটে উঠল ক্ষীণ হাস্যরেখা। একটু আগে ধাড়া বন্ধুত্বের কথা তুলেছিলেন। তিনি জানেন সে বন্ধুত্বের মূল কোথা।

চেকবই বার করলেন রায়চৌধুরী।

দেবী ফিরে এসেছে।

আবাল বৃদ্ধ বণিতা ভীড় করে এল। তারা হঠাৎ যেন নিরাশ্বাস হয়ে পড়েছিল। ভয়ে ও বিস্ময়ে অকস্মাৎ হয়েছিল দিশাহারা। ক্রোধে ও উত্তেজনায় বিভ্রান্তও হয়ে গিছল।

তারা কি করবে, কোন পথে এগোবে, দেবী ছাড়া সেকথা তাদের কে বলে দেবে? 'আষাঢ় মাস চলছে, বৃষ্টি ইতিমধ্যে হয়েছে মাত্র একটি দিন। বোশেখ জ্যৈষ্ঠের রোদে শুকনো ফুটিফাটা মাটি আকাশের সেই গণ্ডুষ জল নিঃশেষে শুষে নিয়ে আবার হয়ে উঠেছে তৃষ্ণার্ত।

বীজধানের চারাগুলো জ্বলে গেল।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে।

তাদের হতাশ চোখের দৃষ্টি দেবীর দিকেই নিবদ্ধ। এই অনাবৃষ্টিকে তারা ভয় করে। বরাবরই দেখা গেছে প্রথমে অনাবৃষ্টিতে ফসল জ্বালিয়ে দিয়ে শেষে আসে অতিবৃষ্টি। ধাত্রী গর্জন করে ফুলে ওঠে। ক্রুদ্ধা নাগিনীর মতো কূল ছাপিয়ে ছুটে আসে ভৈরব গতিতে। যে সামান্য ফসল ফলেছিল তাও যায়, তার সঙ্গে বিপর্যস্ত হয়ে যায় সাধের সংসার,

শান্তির নীড়। নিজের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদবার আশ্রয়ও থাকে না।

মৃত্যু আসে শোভাযাত্রা করে।

তার পরেও পরিত্রাণ নেই। জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় মহামারী। মৃত্যুর একচ্ছত্র রাজত্ব।

জমিদারও ওদিকে আলস্যে সময় নষ্ট করে না। বকেয়া আদায় করবার জন্য তার দৃষ্টি সদা সতর্ক।

তাদের এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল দেবী। তার পরিকল্পনা ছিল, বাঁধ দিয়ে বন্যার গতি রোধ করবার আর জমিদারের সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে একটা খাল কেটে আনবার। অনাবৃষ্টির সময়ে দুপাশের ক্ষেতে যাতে সেচের কাজ চলে। জমিদারের খাস জমিতে খাল কাটাবার সুবিধা ছিল এই, তাতে ফসলের জমির ক্ষতি হত না, উপরন্তু বন হয়ে উঠত আরো উর্বর। জমিদারই তাতে লাভবান হতেন।

এই দুর্ভেদ্য শালের জঙ্গল জমিদারকে বহু টাকা দেয়।

এবারেও তারা অসীম প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে দেবীর দিকে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। ঘটনাচক্র আবর্তিত হচ্ছে কুটিল গতিতে। কিন্তু তাদের ধৈর্যও সীমাহীন নয়।

চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে দেবী। একসঙ্গে তারা আজ জানাবে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা আর দেবীর কাছে আবেদন, কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করো দেবী।

তাদের সে আবেদন জানাতে হল না। স্কুলবাড়ীর মাঠে সমবেত জনতার সম্মুখে ঘোষণা করলে সোমনাথ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথায়, কাল ভোর থেকে আমরা কাজ সুরু করব।

সহস্র সহস্র লোক একসঙ্গে জয়ধ্বনি করে উঠল দেবীর। তাদের সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়ে উপ্‌ছে পড়তে লাগল কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা।

মঞ্চ থেকে অভিভূত দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়েছিল গৌরী। সোমনাথ উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিচ্ছিল, একসঙ্গে আরম্ভ হবে খাল কাটা আর বাঁধ দেওয়ার কাজ। জঙ্গলে খাল কাটার নেতৃত্ব গ্রহণ করব আমি, আর স্বয়ং দেবী বাঁধ দেওয়ার কাজে নেবেন নেতৃত্বের ভার।

আর একবার তুমুল জয়ধ্বনি হ'ল।

সোমনাথ বলে যাচ্ছিল একাগ্র হয়ে, যে অত্যাচারী জমিদার দেবীকে অপহরণ করেছিল, আমরা তাকে ক্ষমা করব না। আমাদের এর পরের দাবী হবে জমিদারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। এই সম্পর্কে আমরা কলকাতার সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছি। সমস্ত সংবাদ নিয়ে পণ্ডিতমশাই কলকাতা গেছেন। আগামী কালই এই হীনপ্রবৃত্তি জমিদারের কুকীর্তির কথা সকলে জানতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাবীও উঠবে জোরালো হয়ে। নিজেদের ভাগ্য আমরা নিজেরাই গড়ে তুলব। যে জমিদার প্রজাদের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানে বাধা দেয়, নারী হরণ করে তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

—কোন সম্পর্ক নেই!—চেঁচিয়ে উঠল শশী। তার সঙ্গে চীৎকার করতে লাগল হাজার হাজার লোক।

—আজ রাত্রিতে তোমরা যে যার গ্রামে ফিরে গিয়ে তোমাদের যে গ্রাম-পঞ্চায়েত ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে দেখা করবে। কি ভাবে, কোনখানে তোমরা কাজ আরম্ভ করবে সে কথা তারাই বলে দেবে। ব্যবস্থা করা হয়েছে যতদূর সম্ভব যে যার নিজের নিজের গ্রামেই কাজ করবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতদের সমস্ত নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রত্যেক গ্রাম থেকে কয়েকজন আসবে আমার সঙ্গে খাল কাটার কাজে যোগ দিতে। তোমরা আর দেরী না করে অবিলম্বে ফিরে যাও। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হবে। সময়

ঠিক রাখবার জন্যে বনশ্রী থেকে আমরা শঙ্খধ্বনির আয়োজন করেছি। এখান থেকে শাঁখের আওয়াজ পেলে তোমরাও গ্রামে গ্রামে শাঁখ বাজাবে। বাড়ীর মেয়েদের সে কথা জানিয়ে রেখো। শাঁখের আওয়াজের সঙ্গে আরম্ভ হবে কাজ।

ভাষণ শেষ করলে সোমনাথ।

অপস্রিয়মান জনতার গুঞ্জনধ্বনি দূরে চলে গেল। শশী, জনার্দন এবং আরো কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে চেয়ে গৌরী বললে, যাও, তোমরা এবার বিশ্রাম করে নাও। তোমাদের দেহ ও ও মনের ওপর চাপ বড়ো কম পড়েনি। কাল থেকে আবার যে কাজ সুরু করবে, তার পরিণাম কি তা কে জানে!

শশী কি বলতে যাচ্ছিল গৌরী তাকে বাধা দিয়ে বললে, কোন কথা নয় শশী, যদি কোন কাজ বাকী থেকেই থাকে তো সে কাল হবে। আমার কথার আর প্রতিবাদ করো না।

প্রতিবাদ করলে না শশী। জনার্দনের হাত ধ'রে মৃদু হেসে সে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল।

সেখানে দাঁড়িয়ে রইল শুধু সোমনাথ আর গৌরী।

গৌরীকে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত ব'লে মনে হচ্ছিল। অপহৃতা হওয়ার পর থেকে সে এখনো পর্যন্ত একমিনিট বিশ্রাম পায়নি। বজরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য গভীর রাত্রিতে লিচুর বাড়ী থেকে হাত পা বেঁধে যখন তাকে পাল্কীতে তোলা হ'ল তখন বাধা দিতে গিয়ে সে আঘাতও পেয়েছিল। সেই আঘাতের যন্ত্রণা এখনো রয়েছে।

সে জানত না তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে লিচু ছিল, কিন্তু ঘৃণায় সে একটি কথাও কয়নি তার সঙ্গে। সে শুধু প্রতীক্ষা করছিল, কখন দেখা হবে জমিদারের সঙ্গে। একটি পদাঘাতে জমিদারের দুরাশা ভেঙে দেওয়ার জন্য সে অধীর হয়ে উঠেছিল।

আভাসে ইঙ্গিতে লিচুও তাকে কোন কথাই বলেনি।

উদ্বেগ আর অস্বস্তিতে গৌরীর চিত্ত ভরে উঠেছিল। এই অবর্ণনীয় নীচতায় সে গিছল স্তম্ভিত হয়ে। এতখানি হীনতার পরিচয় যে জমিদার সত্য সত্যই দেবে, সে তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

সোমনাথকে নিয়েও তার উদ্বেগ বড়ো কম ছিল না।

তার জন্য সোমনাথের একি বিড়ম্বনা ভোগ ?

বিকাশের কাছ থেকে সোমনাথের জীবনের ঘটনার কথা সমস্ত শোনবার পর সাগ্রহে তাকে সে বলেছে, দিন বিকাশদা, ওঁকেই পাঠিয়ে দিন আমাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্য। আপনিও তো ওঁর তরে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যে আঘাত উনি পেয়েছেন, কাজে মন ঢেলে না দিলে সে আঘাত উনি ভুলতে পারবেন না।

—আমি তো তাই ভাবছি গৌরী, তোমাদের কাছেই ওকে পাঠাব।—উত্তর দিয়েছে বিকাশ, তা ছাড়া তোমার সাহচর্যও ওর পক্ষে এখন একটা মস্ত বড়ো লাভ। যে ক'রে হোক ওর মনের ক্ষত সারিয়ে তুলতে হবেই।

সোমনাথ এসব কথা জানে না।

কিন্তু গৌরীর সাহচর্যে মনের ক্ষত সেরে ওঠা দূরে থাক, জীবন নিয়ে টানাটানি হবে সে কথা কি সেই জানত ?

পাল্কীতেও তার মন জুড়ে ছিল সোমনাথের চিন্তা। নিস্তব্ধ রাত্রিতে পাল্কী অগ্রসর হচ্ছিল নিঃশব্দে। একটা কৌতূহলও তার মনে ছিল। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

এক জায়গায় বাহকরা পাল্কী নামালে। স্থানটির সম্বন্ধে গৌরীর কোন ধারণা ছিল না। রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে প'ড়ে। নড়বার শক্তি নেই। সুতরাং কোথায় এল সেকথা জানবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে থাকতে হ'ল নিশ্চেষ্ট হয়ে।

সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা বিদ্বিত ক'রে শব্দ উঠল : 'রে রে রে রে।'

গৌরী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ডাকাত পড়লো নাকি? সে আতঙ্ক দূর হতেও দেরী হল না। সে শুনতে পেলে শশী আর জনার্দনের কণ্ঠস্বর।

...ছোটখাটো একটা খণ্ডযুদ্ধ। দু'একজন আহতের আর্তনাদ। তার পরেই জনার্দন পাল্কী অধিকার করলে। সেই পাল্কী চ'ড়েই গৌরী বনশ্রীতে ফিরে এল ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে। উদ্বেগ আর আতঙ্ক নিয়ে পণ্ডিত প্রতীক্ষা করছিলেন। পাল্কী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, ফিরে এসেছিস দেবী?

বিজয়ী বীরের মতো দাঁড়িয়ে জনার্দন, শশী আর রাজার গাঁয়ের বাগ্দীরা।

সোমনাথ শয্যা থেকে উঠে এল কম্পিত পদে। তাকে দেখে গৌরীর বুক থেকে বেরোল একটা স্বস্তির নিশ্বাস। তাহ'লে সোমনাথের জীবন রক্ষা পেয়েছে?

দুজনেই একসঙ্গে তাকাল দুজনের দিকে। হঠাৎ দুজনের দৃষ্টিই হয়ে উঠল ভাষাময়।

খবরটা ছড়িয়ে পড়লো আগুনের মতো, যেমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল দেবীর নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর। এগ্রাম ওগ্রাম থেকে লোক ছুটে এল। সোমনাথ শশীকে বললে, সভার আয়োজন করো!

পণ্ডিতকে সেই পাঠালে কলকাতায় সংবাদপত্রের জন্যে বিবৃতি রচনা ক'রে। তারপর দুর্বল দেহ নিয়ে যথাবিধি সভাও পরিচালনা করলে। আগামী কাল থেকে তাদের প্রধান কার্য আরম্ভ হবে। বনশ্রীর ইতিহাসে আগামী কাল একটি স্মরণীয় দিন।

—কি ভাবছেন?

গৌরীর চিন্তা ভঙ্গ হল। কি আশ্চর্য, এ প্রশ্ন তাকে করছে সোমনাথ? সে হেসে ফেললে।

সোমনাথ বললে, আপনিও তাহলে চিন্তা করেন?

—আপনি কি ভাবেন, ওই গৌরব আপনার একার প্রাপ্য?

সোমনাথ বললে ম্লান হেসে, দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করায় আবার গৌরব কিসের?

—দুর্ভাগ্য। আত্মগতভাবেই কথাটা বললে গৌরী, আমিও ভাবছিলুম আমার দুর্ভাগ্যের কথা।

—চলুন বাড়ীতে যেতে যেতে ভাববেন।—সোমনাথ বললে।

—তাই চলুন।

তারা দুজনে একসঙ্গে অগ্রসর হল। রাত্রির অন্ধকার ইতিমধ্যেই উঠেছে ঘন হয়ে। প্রহর ঘোষণা করে শিয়ালগুলো এইমাত্র স্তব্ধ হয়ে গেল। স্কুলবাড়ীর মাঠের বিরাট বটগাছটা থেকে একটা প্যাঁচা শুধু ডেকে উঠতে লাগল থেকে থেকে গম্ভীর স্বরে।

হঠাৎ গৌরী বললে, দুর্ভাগ্য আপনার মনে গভীর ছাপ এঁকে দিয়ে গেছে, না?

—হ্যাঁ। সবচেয়ে আফশোষের বিষয় এই যে সে ছাপ আঁকতে আমার দুর্ভাগ্যকে আমি নিজেই সাহায্য করেছি।

—কি রকম?

—প্রতীকারের সমস্ত পথ আমার হাতের মধ্যেই ছিল। কিন্তু আমি নির্বিকার হয়ে দিন কাটিয়েছি। এ দুঃখ আমার যাওয়ার নয়।

—মানে, সুখ-সৌভাগ্য আপনাকে আমন্ত্রন জানানো সত্ত্বেও আপনি সে আহ্বানে সাড়া দেননি?

—ঠিক তা নয়।—গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে সোমনাথ, বরং এই কথা বলাই ঠিক যে, দুঃখ ও দুর্ভাগ্যকে আমি ডেকে এনেছি। আর সেজন্য একটি অমূল্য জীবনও অকালে ঝরে পড়েছে।

সহানুভূতিতে গৌরীর কণ্ঠ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। সে বললে, ওকথা ভেবে অনর্থক নিজেকে অপরাধী মনে করছেন কেন? সত্যিই কি আপনি নির্বিকার হয়েছিলেন?

—ইঁদুর জাঁতিকলে পড়লে যে অবস্থা হয় আমার তখন সেই রকম অবস্থাই হয়েছিল।

—তাই হয়! কুটিল ঘটনাচক্রের আবর্তে একজনকে আপনি হারিয়েছেন এ দুঃখ আপনার সীমাহীন, কিন্তু জন্মের মুহূর্তে দুর্ভাগ্যকে সাথী ক'রে যে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হল এবং তার পরমুহূর্ত থেকে সারা পৃথিবী যাকে দেখতে লাগল ঘৃণার দৃষ্টিতে, মা যে সন্তানকে কোলে না তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে গেল নদীতীরে, শিয়াল কুকুরের ভক্ষ হওয়ার জন্য, পিতৃপরিচয় যার কাছে চিরদিনই রইল অজ্ঞাত, তার দুঃখের অনুভূতি কতো গভীর সে কথা চিন্তা করতে পারেন?

—সে কে গৌরী?—আবেগে সোমনাথ এমনি উদ্বেল হয়ে উঠল যে ভদ্রতাসম্মত আপনি সম্বোধনটার কথা আর মনেই রইল না।

—আমি।—অস্পষ্ট কণ্ঠে গৌরী বললে।

সোমনাথের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে কিনা অন্ধকারে তা দেখা গেল না। কিন্তু তার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল উত্তেজনায়। সে কোন কথা বলতে পারলে না।

গৌরী বললে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, একথা পণ্ডিতদাদা, গুরুদেব আর বিকাশদা ছাড়া আর কেউ জানে না। যেদিন গাঁয়ের লোকেরা জানবে, তাদের নেত্রী অজ্ঞাত-কুলশীলা, জারজ, সেদিন ঘৃণায় তারাও আমার দিক থেকে মুখ ফেরাবে। এই দেশজোড়া খ্যাতি, প্রতিপত্তি এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। ধাত্রীর জল ছাড়া সেদিন বোধ হয় আমার জন্য আর কোন আশ্রয় থাকবে না।

সোমনাথ যেন কি রকম হয়ে গিছল। দৃঢ়মুষ্টিতে গৌরীর একখানা হাত ধরে সে বললে, তুমি বলছ কি ?

পথ চলতে চলতে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। গৌরী বললে, সত্যি কথাই বলছি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মা আমাকে নদীতীরে ফেলে দিয়ে যান কলঙ্ক এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। গুরুদেব সৌভাগ্যক্রমে সেখান দিয়ে আসছিলেন, আমার কান্না শুনে তিনি কোলে তুলে নেন। যদি না নিতেন, তাহলে এই কলঙ্ক আমাকে আজ এমনিভাবে ঘোষনা করতে হত না।

— তারপর ?—রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে সোমনাথ।

তারপর তাঁরই এক শিষ্যার আশ্রয়ে মানুষ হই। আমি যখন সাত বছরের তখন গুরুদেব আমাকে আশ্রমে আনেন। আমার যা কিছু শিক্ষা সেই আশ্রমেই। সেখানেই আমি পরিচিত হই বিকাশদার সঙ্গে।

— বিকাশদা আশ্রমে যেতেন বুঝি ?

— হ্যাঁ। আমার গুরুদেবও একজন ভূতপূর্ব বিপ্লবী। পরে সন্যাস গ্রহণ করেন। একসময় তিনি বিকাশদার সহকর্মী ছিলেন।

সোমনাথের মনে হ'ল কালো অন্ধকারের উপরে আরো কয়েকখানা কালো পর্দা কে যেন চাপিয়ে দিয়েছে। সেই রাত্রির কথা মনে পড়লো। গৌরী বলেছিল, 'আপনি জানেন না, দেবী কেন দাসী সম্বোধনের যোগ্যও আমি নই।'

ক্ষান্তর বাড়ীতে গৌরীর সেই বিলাপের অর্থও আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে গৌরীর আরো নিকটে সরে গেল। এত নিকটে যে গৌরীর দেহ তার দেহ স্পর্শ করছিল। গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, তোমার গুরুকে আমি উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছি এইম হামূল্য জীবনটি রক্ষা

করবার জন্যে। আর প্রণাম করি তোমার জীবন-বিধাতাকে যিনি বিষের পাত্র অমৃতে পূর্ণ ক'রে এক বিচিত্র জীবন-লীলার সৃষ্টি করেছেন। যে জীবনরস ধাত্রীর জলধারার মতই সহস্র সহস্র মানুষের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। নিজের দুঃখে আমি অভিভূত, কিন্তু তোমার দুঃখের কথা আমার সমস্ত দুঃখকেই আজ ভুলিয়ে দিলে। গৌরী, অস্বীকার করব না, পিতৃপরিচয় এক মহামূল্য সম্পদ। সে সম্পদে যে বঞ্চিত তার মর্মপীড়া যে কি ভয়ানক, তোমাকে দেখে তা অনুভব করছি। কিন্তু তবু বলি এতে দুঃখ কিসের? আমাদের সম্মুখেই তো দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহাভারতের কর্ণ আছেন, সত্যকাম আছেন, তাঁদেরই মতো তুমিও থাকবে গৌরী। তোমার জন্মের কলঙ্ক কর্মের সোনার কাঠির স্পর্শে গৌরবে রূপান্তরিত হবে।

গৌরী কাঁদছিল, সোমনাথ কোঁচার খুঁট দিয়ে সযত্নে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর তেমনিভাবে তার হাত ধরে বললে, দুঃখ আর নয়, তোমারই হোক আর আমারই হোক, এস দুঃখকে এবার ছুঁড়ে ফেলে দিই। মানুষ এই পরিচয় নিয়ে আমরা জন্মেছি। সেই পরিচয়ের স্বাক্ষরই আমরা রেখে যাব পৃথিবীতে। পৃথিবী আমাদের গ্রাহ্য না করে নাই করল, তোমার জন্যে আমি আছি। পণ্ডিতদাদা আছেন, আছেন গুরুদেব। আর আমার জন্য আর কেউ না থাকুক অন্তত তুমি আছ এ আশা করা কি আমার পক্ষে অসঙ্গত হবে গৌরী?

গৌরী প্রত্যুত্তরে কিছুই বললে না। শুধু তার হাত দিয়ে সোমনাথের অপর হাতখানি জোর করে চেপে ধরলে। দূরে পেচকের কর্কশ কণ্ঠের ডাক তখনো শোনা যাচ্ছে।

গভীর রাত্রিতে সোমনাথ বসে লিখছিল।

গৌরী কখন ঘরে এসে ঢুকেছে সেকথা সে বুঝতে পারেনি। একাগ্রচিত্তে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে লিখে যাচ্ছিল।

—মস্তিষ্ককে একটু বিশ্রাম দিলে ভালো হ'ত না ?—গৌরী বললে, দেহ তো এখনো যথেষ্ট দুর্বল ?

—সে তো দুজনেরই।—হেসে সোমনাথ বললে।

—তাহলেও আমার ফাটা মাথা থেকে রক্তও বেরোয়নি আর অচৈতন্য অবস্থায় নদীর স্রোতে আমাকে ভেসে যেতেও হয়নি, যে যাত্রা অনায়াসেই মহাযাত্রা হয়ে উঠতে পারত।

—দুর্ভাগ্যক্রমে তা হ'ল না।—সোমনাথ বললে।

—ও কথা বলতে নেই।—হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল গৌরী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, আমি কিন্তু এইবার আলো নিভিয়ে দিয়ে যাবো। আজ রাত্রিতে একটু ঘুমের খুব বেশী প্রয়োজন। কাল সকাল থেকে শরীর ও মনের ওপর যে চাপ পড়বে তার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হবে তো ?

—হবেই তো।—সোমনাথ বললে, সেই জন্যই তাড়াতাড়ি একটা জরুরী কাজ সেরে নিচ্ছি। এই লেখাটা শেষ করেই শোব।

—পরে বুঝি আর লেখবার সময় পাওয়া যেত না?—গৌরী বললে, আমি তো যতদূর জানি, জরুরী লেখাপড়ার কাজ এখন কিছুই নেই। প্রেসের প্রয়োজনীয় লেখা নিয়ে পণ্ডিতদাদা চলে গেছেন। বনশ্রী গ্রাম রক্ষা সমবায়ের রিপোর্ট শশী লিখে রেখেছে। আজকের সভার বিবরণও লেখা হয়ে গেছে। ঘুম বন্ধ করে লেখবার মতো কিছুই তো বাকী নেই।

—আছে।—হাসল সোমনাথ, Press Statement, বনশ্রী গ্রাম রক্ষা সমবায় আর সভার রিপোর্টের মধ্যেই লেখার কাজটাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে আমি পারছি না। ওইগুলো ছাড়া আমার আরো কিছু লেখবার আছে আর সেই লেখা মুলতুবী রাখা চলে না।

—আমিও তো তাই জানতে চাইছি সেই লেখার বিষয়বস্তু কি?

—নিতান্ত ব্যক্তিগত।—সোমনাথ বললে, তুচ্ছ কয়েকটা লাইন নিয়ে কসরৎ করছিলুম নিছক খেয়ালের বশে। আজকের রাত্রিটাও মুক্ত আছি কাল নাও থাকতে পারি। তাই খাতা পেন্সিল নিয়ে বসেছিলুম একটু। শেষ করে ফেলেছি। তুমি যাও। আমি এখনি শুয়ে পড়ব।

—'তুচ্ছ কয়েকটা লাইন?'—সোমনাথের কথার পুনরাবৃত্তি করতে করতে ফস্ করে গৌরী খাতাখানা তার সামনে থেকে টেনে নিলে।

বাধা দেওয়ার ভঙ্গীতে সোমনাথ বললে, খবরদার গৌরী, ও দেখতে নেই! ও আমার ব্যক্তিগত জিনিষ।

—মোটেই ব্যক্তিগত নয়, কবিতা কি আবার ব্যক্তিগত জিনিষ হয় নাকি? প্রকাশের জন্যই তো কবিতার প্রেরণা পায় কবি।—হাসতে হাসতে গৌরী বললে।

—তা হোক। ও কবিতা দেখতে দিতে আপত্তি আছে।

—সে আপত্তি গ্রাহ্য করবে কে?—খিলখিল করে হেসে উঠল গৌরী।

স্তব্ধ হয়ে গেল সোমনাথ। এই হাসি যতোবার সে শুনেছে ততোবারই স্তব্ধ হয়ে গেছে। দুকূল-প্লাবিনী নদীর কলস্বনের মতো ঝঙ্কারময় এই হাস্যধ্বনি যেন বয়ে নিয়ে আসে একটা অচিন্তনীয়, অকল্পণীয় আনন্দময় শিহরণ যার কোন তুলনা সে খুঁজে পায় না। জ্যোৎস্না রাত্রিতে আকাশের ছায়াপথে যে রহস্য প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, শান্ত সমুদ্রের অটল গাম্ভীর্যে যে মহিমার প্রকাশ দেখা যায়, তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখরে প্রভাতের সূর্যালোক যে বিচিত্র বর্ণজাল সৃষ্টি করে তার মধ্যে এই আনন্দের আভাস আছে। এ আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর কোন সম্পর্ক নেই। এইজন্যই গৌরীকে মাঝে মাঝে তার রহস্যময়ী বলে মনে হয়।

তার চিন্তা স্রোত রুদ্ধ হ'ল। গৌরী বলছিল, ভুলে গিছলুম, বিকাশদাই তো বলে দিয়েছিল, 'সাবধান থেকো গৌরী, লোকটি একটু ছিটগ্রস্ত।'

হাসল সোমনাথ। কিন্তু ভাবতেও লাগল সে। আজ সন্ধ্যায় সভার পরে এই গৌরীরই আর এক রূপ দেখেছে সে। যে গুরুভার দুঃখ সে বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, ভারসাম্য রাখতে না পেরে আভাসে ইঙ্গিতে কখনো কখনো যে দুঃখকে সে প্রকাশ করে ফেলেছে তাকে সম্পূর্ণরূপে আজ সে উদ্ঘাটিত করেছে তার কাছে। কিন্তু তার সেই রূপ আর এখন নেই। যে আহত ও বিক্ষুব্ধ নারীচিত্তের পরিচয় সে আজই পেয়েছে, ভাগ্যহীনা যে বঞ্চিতার প্রতি সহানুভূতিতে উঠেছে উদ্বেল হয়ে, এই হাস্যময়ী, চপলা, চঞ্চলা তরুণীকে দেখে কে বলবে যে এ সেই? কতো শীঘ্র নিজেকে সহজ করে নিতে পেরেছে গৌরী?

—লেখা তো হয়ে গেছে। এখনো কি ভাবা হচ্ছে?—গৌরী বললে।

মনের ভাব গোপন করে সোমনাথ বললে, ভাবছি লেখাটা কেমন হ'ল।

—পড়ি তাহলে? পড়লেই বোঝা যাবে।—পড়তে আরম্ভ করলে গৌরী:

সে যে হ'ল কতোকাল—শুনেছিনু বাঁশী,
বয়েছিল যমুনায় সে দিন উজান,
প্রস্ফুটিত কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুমের রাশি।
সুরভিত সে রাত্রির—শিহরায়মান
নিঃশব্দ নক্ষত্রপুঞ্জ সহসা উদ্ভাসি
উঠেছিল অন্ধকারে—উজ্জ্বল অম্লান।
সফেন তরঙ্গশীর্ষে এসেছিল ভাসি
উচ্ছল কল্লোলে ভরা আকুল আহ্বান।

মর্ম্মের মর্ম্মরে আজো সে সুর মুখর,
পথ চলি, বাঁশী বাজে গুমরি গুমরি।
অন্তহীন চলা—গতি হয়েছে মন্থর,
তন্দ্রালু ক্লান্তির মতো কাঁপিছে শর্বরী।
শ্রান্ত, শ্লথ পদক্ষেপ! প্রতীক্ষা-প্রখর—
দুর্গমের শেষ দুর্গ—কাছে আসে সরি।

—বাঃ! চমৎকার হয়েছে। তুমি এত ভালো কবিতা লেখো?—গৌরী বললে।

—ভালো তো লিখি না। তবে অদৃষ্টে আজ প্রশংসাটুকু পাওনা ছিল। একথা স্বীকার করতে হবে বৈকি।—বললে সোমনাথ, কিন্তু আমার জীবনের একটা গোপন কথা আজ জেনে ফেললে তুমি। যা জানাবার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না।

স্থির ও গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল গৌরী। তারপর হঠাৎ বলে উঠল গাঢ়স্বরে, আর আমি যে আজ আমার জীবনের সমস্ত গোপন কথা তোমার কাছে বলেছি? সেই লজ্জা ও কলঙ্কের কথা প্রকাশ করতে কোন সঙ্কোচই তো আমাকে বাধা দিতে পারেনি? আমার এইভাবে আত্মপ্রকাশের পরেও তুমি আমার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে?—শেষের দিকে আবেগে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

সোমনাথের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের একটা আবরণ যেন সরে গেল। ব্যথিত কণ্ঠে সে বললে, ভুল বুঝো না গৌরী, তোমার আত্মপ্রকাশ আমার কাছে লজ্জা বা কলঙ্কের প্রকাশ নয় এ এক মহৎ আত্ম-উদ্‌ঘাটন। তার সঙ্গে আমার কবিতা লেখার কথার তুলনা কেন করছ তুমি? স্বভাবতই আমি আমার লেখার অভ্যাসের কথা কাকেও জানাই না। এবিষয়ে কেমন একটা দুর্বলতা আছে আমার। শুধু এই কারণেই যদি তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করো তাহলে আমার দুঃখ রাখবার আর জায়গা থাকবে না।

—আমি যখন তোমাকে সব বলেছি তখন এই আশাই তো আমি করব যে তুমিও আমার কাছে কিছু গোপন করবে না?—গৌরী বললে।

এবার হাসল সোমনাথ। বললে, এই একটা জিনিষই আমার জানতে বাকী ছিল। গৌরী অসাধারণ, গৌরী জননেত্রী, গৌরী অনেক কিছু এই কথাই এতদিন জেনে এসেছি। পনেরোখানা গ্রামের গৌরীই হ'ল

হৃদ্‌স্পন্দন একথাও বিশ্বাস করেছি। প্রথম যেদিন স্বপ্নগনগরে পা দিই সেদিন দেবী নামটা শুনে একটু ধাঁধাও লেগেছিল। ভেবেছিলুম 'দেবী চৌধুরাণী'র পাল্লায় গিয়ে শেষটা পড়তে হল নাকি? তারপর দেখা হওয়ার পরে প্রথমে সঙ্কোচ পরে শ্রদ্ধাও জানিয়েছি মনে মনে। ভেবেছি সার্থক হয়েছে গুরুদেবের 'দেবী' নাম দেওয়া। কিন্তু এত কিছু জানা সত্ত্বেও গৌরী ছেলেমানুষ একথাটা আমার জানতে বাকী ছিল। সেকথা আমি অসঙ্কোচেই স্বীকার করছি।

—কবি হওয়ার সুবিধা এই। কথার আতসবাজীতে আসর মাত ক'রে দেওয়া যায়।—গৌরী বললে।

—তেমন কবি আমি নই।

—যেমনই হও। আজ থেকে কোন তুচ্ছ জিনিষও আমার কাছে গোপন করবে না এই প্রতিশ্রুতি দাও?

—এই মুহূর্তে দিচ্ছি।—সোমনাথ বললে, খোলা কবিতার খাতার মতো হৃদয় আমার তোমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে রইল। এখন তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, আজ রাত্রে শোওয়ার প্রয়োজন আর বোধ করছ কি?

হেসে উঠল গৌরী। তারপর বললে, ঘুম পাচ্ছে না। যদিও তোমাকে ঘুমোবার জন্যই বলতে এসেছিলুম। মনে হচ্ছে রাতটা জেগেই কাটাই। কাল থেকে আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ হবে। কি তার পরিণাম তা কে জানে? তবু এমন একটা উৎসাহ আর উত্তেজনা অনুভব করছি যে মনে হচ্ছে এখনি ছুটে চলে যাই।

—আমিও।—সোমনাথ বললে, ভবিষ্যত বিষ বা অমৃত যাই নিয়ে আসুক না কেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমিও অধৈর্য হয়ে উঠেছি। আশ্চর্য যুদ্ধ আমাদের। কল্যাণ আর শান্তি যার চরম লক্ষ। তবু ঘুমোবার চেষ্টা করতেই হবে। আজ রাত্রিতে আমাদের দুজনের মধ্যে যে ঘুমোতে পারবে বুঝতে হবে তারই স্নায়ু সবল।

—বেশ, সেই চেষ্টাই করি।—হাসতে হাসতে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বাজল পণ্ডিতের বাড়ী থেকে। মুহূর্তমধ্যে বনশ্রী মুখর হয়ে উঠল শঙ্খধ্বনিতে। আশপাশের গ্রামগুলোও সাড়া দিলে। শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে আকাশে বাতাসে সৃষ্টি করলে আলোড়ন।

গৌরী আর সোমনাথ হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়লো। দুজনেই যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নবজীবনের দীপ্তিতে। দুজনের চোখেই নতুন উৎসাহ। চৈতন্যের মূলে যেন নবপ্রেরণার সঞ্চার হয়েছে।

গৌরী পরেছে পরিচিত সেই কালো শাড়ীখানি। অজস্র চুল ঝাঁপিয়ে পড়ছে পিঠে। তার বিশাল চোখে এক দুর্বোধ্য ইঙ্গিত।

সোমনাথ বললে, আমরা পদক্ষেপ করছি। আমাদের সঙ্গে পদক্ষেপ করছে বনশ্রী এবং আরো পনেরোখানা গ্রাম। হাজার হাজার কৃষক একসঙ্গে অগ্রসর হবে। তারা চলেছে ইতিহাস রচনা করতে।

গৌরী বললে, গুরুদেবকে জানাচ্ছি মনে মনে, ইতিহাস যেন সত্যিই রচিত হয়। প্রতিশ্রুতি যেন সার্থক হয়ে ওঠে।

সোমনাথ আর গৌরী মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। আকাশের পূর্বপ্রান্ত আরক্ত করে সূর্য উঠছে।

গৌরী তাকে বললে, তুমি তাহলে শশীকে নিয়ে বাঁ দিকে যাও। পঞ্চায়েতদের নির্দেশ দেওয়া আছে প্রত্যেক গাঁয়ের দশজন ক'রে লোক বনের সামনে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আমি যাব ডাইনে।

—বেশ!

সোমনাথ মুহূর্তের জন্য গৌরীর মুখের দিকে চাইলে। গৌরীও চেয়েছিল তার দিকে। পরস্পরের কাছে নীরবে বিদায় নিলে তারা। শুধু উভয়ের দৃষ্টি হয়ে উঠল ভাষাময়।

দুজনেই জানত, যে কাজে হাত দিতে তারা চলেছে সে কাজের পুরোভাগে পর্বতপ্রমান বাধা উত্তুঙ্গ হয়ে আছে। সেই বাধা অতিক্রম করতে হবে।

শশী অপেক্ষা করছিল।

সোমনাথ শশীকে নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলল। ধাত্রী কল্লোলময়ী। তার প্রখর স্রোত বয়ে চলেছে বিরামহীন বিশ্রামহীন। তীরবর্তী সরু ও আঁকাবাঁকা পথ ধরে তারা অগ্রসর হচ্ছিল অরণ্যাভিমুখে। এই পথ ধরেই সোমনাথ প্রথম প্রবেশ করেছিল বনশ্রীতে। অরণ্যকে পাশে রেখে মুগ্ধ কৌতূহলে অপরিচিত পথিকের মতো সে এসেছিল দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই শুধু পরিচয় নয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে অরণ্যময় কর্মক্ষেত্রে রাখতে চলেছে এক নতুন পরিচয়ের স্বাক্ষর।

অতীত আজ আর তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে নেই। শিপ্রাকে সে ভোলেনি। আজো সে তাকে স্মরণ করছেঃ উৎসাহ দাও, প্রেরণা দাও শিপ্রা! সুখী হতে চেষ্টা করছি আর একবার। ক্ষণকালকে ধরে রাখতে চাইছি অনন্ত-কালের গর্ভে। মাকে নিয়ে নয়, মানুষকে

নিয়ে সুখী হবো। আত্মার অবিনশ্বরতা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমার মনে প্রেরণার সঞ্চার করো। বেদনা আমার আনন্দ হয়ে উঠুক।

এক বিচিত্র নারীর সাহচর্য সে পেয়েছে। এই সাহচর্যের বৈশিষ্ট সে রক্ষা ক'রে চলবে। কর্মের বলিষ্ঠ আদর্শে সে প্রবুদ্ধ। তার ধ্যান আর জপের মন্ত্র কর্ম। সেই কর্মযোগিনী সহচরী তার জীবনে এনেছে এক অপূর্ব পরিকল্পনা। সে জানে এও ক্ষণকালের দান।

তার মতো সোমনাথও নিজের সুখ আর দুঃখকে তুচ্ছ করুক। যে গ্রাম তার জীবনে নিয়ে এল এই নতুন ঐশ্বর্য-সম্ভার, তার চিত্তকে তুলল পরিপূর্ণ ক'রে, সেখানকার সুখ-দুঃখই তার সুখ-দুঃখ। সেই গ্রাম সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক ফুলে ও ফসলে। সেখানকার পরিশ্রমী, সরল আর নির্বোধ মানুষগুলি ভোগ করুক সহজ জীবন ধারণের স্বচ্ছন্দ অধিকার। আকাশের উদার আলিঙ্গনে সেখানকার মৃত্তিকা স্বর্ণপ্রসু হোক।

সম্মুখেই গভীর অরণ্য। শালগাছের শ্রেণী মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। বিশাল বনস্পতিকে অবলম্বন করে লতাগুল্ম ওপরে উঠছে। আগাছার জঙ্গলে চলার পথ দুর্গম।

বহু পাখীর কণ্ঠস্বরে সেই বিরাট বন মুখরিত হয়ে উঠছে।

রাজার গাঁয়ের তিনু মোড়ল প্রায় শ'দুই লোক নিয়ে তাদের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা এসে পৌঁছেচে রাত্রি থাকতেই।

শশী হর্ষধ্বনি করে উঠল, এয়েচ মোড়লের পো?

—এয়েছি বৈকি।

হেসে উঠল তিনু মোড়ল। তার বলিরেখাঙ্কিত মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত।

—দেরী নয়, কাজ আরম্ভ হোক।—আদেশ দিলে সোমনাথ।

কোনখান দিয়ে কি ভাবে খাল কাটা হবে আগে থেকেই তার সব ঠিক করা ছিল। আদেশমাত্র দুশ লোক কোদাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কাজে। শশী বললে, আপনি দাঁড়িয়ে কাজ দেখুন।

—দেখব মানে? আমিও কাজ করব।—সোমনাথ বললে, আমাকে একখানা কোদাল দাও।

কোদাল, শাবল, গাঁইতি, কাটারি কোনটারই অভাব ছিল না। তিন্থু মোড়ল হাসতে হাসতে তারই হাতের কোদালখানা সোমনাথকে এগিয়ে দিলে। বললে, পারবেন তো? কোদাল ধরা অব্যেস আচে?

—আজ থেকে অভ্যাস হোক।

মাটিতে সবলে কোদাল চালালে সোমনাথ। তার দেহ এখনও দুর্বল।

স্তূপাকার মাটি ধাত্রীর তীরভূমি থেকে কেটে সরু পথের পাশে ঢালা হচ্ছে। একসঙ্গে পনেরোখানা গ্রাম কাজ করছে। হাজার হাজার মানুষ মাটি কাটছে, বয়ে আনছে আর ঢালছে।

গৌরী করছে কাজের তত্ত্বাবধান। ঘর্মধারায় তার সর্বদেহ অভিষিক্ত। একটু আগে ছুটে যেতে গিয়ে পড়ে যাওয়ায় দেহের কয়েক জায়গা কেটে গেছে। তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মর্মে তার বাজছে নতুন সুর।

বিকাশের কথা মনে পড়ছে। সোমনাথের প্রসঙ্গে সে বলেছিল : যে ক'রে হোক ওর মনের ক্ষত সারিয়ে তুলতে হবেই। সারিয়ে তুলছে সে সেই ক্ষত। নতুন জীবনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে সোমনাথ। তার জন্মের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস শুনে সে তাকে ঘৃণা করেনি। প্রীতি ও সহানুভূতিতে তার আবেগপ্রবণ হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

সোমনাথের কাছে সেও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। দুঃখময় অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে করতে হবে পদক্ষেপ।

সেই পদক্ষেপ সুরু হ'ল আজ থেকে।

সকলেই চেয়ে দেখছে তাদের দেবীর দিকে।

গৌরী দিচ্ছে তাদের উৎসাহ। জীবন্ত প্রেরণার মতো তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

সাইকেলে কয়েকজন কর্মী পনেরোখানা গ্রাম টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে অবিশ্রাম। এক একবার ঘুরে এসে গৌরীর কাছে তারা প্রদান করছে বিবরণ। সে আবার তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে।

বয়ে চলেছে কল্লোলমুখরা ধাত্রী।

স্বরূপনগর বাজারের ধারে বিশাল অট্টালিকার দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে বসে আছে লিচু।

এইমাত্র হাইস্কুলের ছেলেদের একটা মিছিল চলে গেল। বনশ্রী গ্রাম রক্ষা সমবায় গ্রামোন্নয়নের কাজ আরম্ভ করেছে। কর্মীদের অভিনন্দন জানাবার জন্য ছেলেরা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখলে লিচু। মিলিত কণ্ঠের জয়োল্লাস! সব বয়সের ছেলেরাই দলে আছে। কি আনন্দ তাদের চোখেমুখে।

লিচুর যদি একটি ছেলে থাকত, সেও তাহলে স্কুলে পড়ত, আর এমনি করে যোগ দিত মিছিলে। উল্লাসে তার কণ্ঠও উঠত প্রদীপ্ত হয়ে।

হঠাৎ নিভে এল তার চোখের দীপ্তি। মুখ উঠল পাণ্ডুর হয়ে। ছেলে তার নেই। একটা সুতীব্র অভাববোধ তার অন্তরের অন্তঃস্থলে বেদনার্ত আলোড়ণের সৃষ্টি করছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কাও জেগে উঠছে মনে।

যে সন্তান তার গর্ভে আসেনি তার প্রতি জেগে উঠছে একটা মমত্ববোধ। আসেনি, ভালই হয়েছে। এলে সমাজে তো সে স্থান পেত না। তাঁকে বেঁচে থাকতে হ'ত প্রত্যেকের ঘৃণা কুড়িয়ে। সে কি এমনি করে বুক ফুলিয়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে যেতে পারত? সে অধিকার তাকে কেউ দিত না।

লিচুর জীবনে ব্যর্থতার বুঝি এই প্রথম অনুভূতি। পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক সঙ্গে নিভে গেছে। অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাস সৃষ্টি, বাতাস পর্যন্ত বইছে না।

তার প্রকাণ্ড বাড়ী আছে, অজস্র অলঙ্কার আছে, আছে প্রচুর অর্থ। অনেকে, এমন কি কোন কোন কুলনারীও, তাকে ঈর্ষা করে। তবু তার কিছু নেই। তার দিনগুলি বয়ে যায় অসার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে। কোন সম্ভাবনা সেখানে স্বপ্ন রচনা করে না।

জীবনে একটি দিনও সে সকাতর-উদ্বেগে কারো জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেনি। না স্বামীর জন্য, না পুত্রের জন্য। চিন্তাহীন, অর্থহীন দিনগুলি বৃথাই বয়ে গেছে। বেশ্যার মেয়ে সে। তার মা-ই তাকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়েছিল। সংসার কি সে তা জানেনা। সংসার কথাটা ভাবতে পর্যন্ত অদ্ভুত লাগে।

দুহাতে মুখ ঢেকে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল লিচু।

বাজার থেকে ভৃত্য ফিরে এল শুধুহাতে।

—দিদিমণি, আজ বাজার হ'ল না।

—কেন রে?—মুখ তুললে লিচু। ভৃত্য বিস্মিত হয়ে গেল। লিচুর চোখে চক্‌চক্ করছে জল।

—কাঁদছ কেন দিদিমণি?

—কে বললে?—হেসে উঠল লিচু, কাঁদিনিতো। চোখে কি পড়েছে বোধ হয়। বাজার হ'ল না কেন তাই বল্? আজ খাব কি?

—খাবে কি মানে ? আজ সব উপোষ। জাননা বুঝি, বনসিঁড়ির অক্ষয় পণ্ডিতকে যে ইষ্টিশনে পুলিসে ধরেছে ?

—সেকিরে ?

—হ্যাঁ, সে কি কাণ্ড ! বাজার-হাট দোকান-পাট সব দুড়্দাড় বন্ধ হয়ে গেল। সকলে মিলে হরতাল করছে। স্বরূপনগর একেবারে তোল-পাড়। কতো লোক যে হায় হায় করছে !

—পণ্ডিতকে পুলিশে ধরলে ? কেন ?

—কেন, তাও জান না ? বনসিঁড়িতে যে ভীষণ ব্যাপার হচ্ছে। ভোরে শাঁখের আওয়াজ শোননি ? আমার ত বুক ধড়ফড় করে উঠল। ভাবলুম ভূমিকম্প হর্চ্ছে।

লিচু শুনেছে শাঁখের আওয়াজ। সেই আওয়াজই তার চিত্তে দোলা দিয়ে গেছে। তার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল দুগরের আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে। গত রাত্রিতে একটু বেশী নেশা ক'রে ফেলেছিল লিচু।

শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দুগরের ঘুম ভাঙিয়ে বলেছে, যাও।

—এত শীগ্গীর ?—দুগর বলেছে জড়িত কণ্ঠে।

—হ্যাঁ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুগর চলে গেছে একপা একপা ক'রে। বয়স হলেও লিচুর আকর্ষণ এখনো আছে।

দুগর চলে যাওয়ার পরেই স্নান করে লিচু ভাবতে বসেছে। তার অনেক পরে গেছে শোভাযাত্রা।

ভৃত্যকে সে বললে, আচ্ছা তুই যা। আজ না হয় শুধু ভাতই খাব।

ভৃত্য চলে গেল। লিচু ভাবতে বসল।

পণ্ডিতেরও স্ত্রীপুত্র নেই। কিন্তু কী দেশযোড়া খ্যাতি, বিপুল প্রতিষ্ঠা ? পঞ্চাশখানা গ্রামের লোকে বলে, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

নিজের বলতে লোকটার কিছুইনেই। স্বর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে পরকে। পরহিতে নিজের জীবন করেছে উৎসর্গ। লোকটার কোন অভাবও নেই।

লিচুরও স্বামীপুত্র নেই। আছে বাড়ী, অর্থ, অলঙ্কার আর দেশ-যোড়া অখ্যাতি। কিন্তু তার অভাববোধ কতো তীব্র?

সে যেদিন মরবে, সেদিন তার মুখে আগুণ দেওয়ার লোকও মিলবে না। যদিও কোন কুলাঙ্গারকে মেলে তো সে আসবে এগিয়ে তার অর্থ আর সম্পত্তি অধিকার করবার লোভে।

কি ব্যর্থ জীবন? তার বুকের ভিতর নিঃশব্দ হাহাকারে আকুল হয়ে উঠল।

পণ্ডিতের মতো লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল?

চেম্বারে বসে আছেন রায়চৌধুরী।

দ্রুতপদে প্রবেশ করলেন ধাড়া। সাফল্যের হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত।

—আসুন মিঃ ধাড়া। খবর কি?

—খবর ভালো।—দিগ্বিজয়ীর মতো ধাড়া বললেন, আপনার খবর কি?

—আপনার উপদেশমত কাজই করেছি। বনে খাল কাটা আরম্ভ হয়েছে শুনেই এককড়ি নায়েবের সঙ্গে পঞ্চাশজন লেঠেল পাঠিয়েছি। আরো পঞ্চাশজন পাঠাব কিনা ভাবছিলুম। শুনলুম রাজার গাঁয়ের বাগ্দীরা ওখানে আছে। তারা ভাল লাঠি খেলুড়ে।

—দরকার হবে না।—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধাড়া বললেন, আর্মড পুলিশ আসছে। এটা যে কম্যুনিষ্টদের একটা আন্দোলন এবং এ আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে, সেকথা আমি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে হেডকোয়ার্টারকে বোঝাতে পেরেছি। এ আন্দোলন দমন করবার ভার তাঁরা আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। একবার বোঝাতে পারলে আর ভাবনা?

—বাহবা মিঃ ধাড়া।—হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে রায়চৌধুরী বলে উঠলেন।

ধাড়া নীরবে উপভোগ করলেন রায়চৌধুরীর প্রশংসাবাদ। তারপর বললেন, ষ্টেশনে নেমেই পণ্ডিতকে ধরেছি। শুনেছেন বোধ হয় ?

—হ্যাঁ। কিন্তু স্বরূপনগরে তার প্রতিক্রিয়া দেখে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। একেই ত ভোর থেকে এখানে হৈ হৈ সুরু হয়ে গেছে। বদ্‌মাইস্‌গুলো কি শাঁখই বাজিয়েছে, জানেন ? আমার গা গস্‌গস্‌ করছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল এক এক ব্যাটাকে ধরে এনে শঙ্করমাছের চাবুক দিযে পিঠের ছাল তুলে দিই।

—প্রতিক্রিয়া হোক, সেজন্যে আমি চিন্তা করি না। ঠেঙানির চোটে সব প্রতিক্রিয়াই ঠাণ্ডা করে দোব। আর্মড পুলিশের বেড়াজালে আটকে ফেলব গ্রামগুলো। দেখি বাছাধনেরা যায় কোথা ? দেবীর দফা এবার রফা। আপনি তৈরী হয়ে থাকুন। এবার তাকে একেবারে নিয়ে এসে হাজির করছি আপনার এই চেম্বারে।

—তা যদি পারেন !-রায়চৌধুরী দন্তশ্রেণী বিকশিত ক'রে হেসে উঠলেন।

—পারব না মানে ? তাহলে আর বন্ধুত্ব কি ?—ধাড়ার চোখ দুটো লোভে চক্‌চক্‌ করে উঠল। একদিকে নিশ্চিত প্রমোশনের আশা, আর একদিকে মোটা অঙ্কের চেক। তাঁকে আর পায় কে ?

তিনি উঠলেন। বললেন, আর সময় নেই। আমাকে এখনি কাজ আরম্ভ করতে হবে।

রায়চৌধুরী বললেন, আর একটা কাজ আমি করেছি। আপনার পরামর্শের জন্যে অপেক্ষা করবার অবসর ছিল না। শ্রীচরণে অনন্ত দাস ব'লে একজন সম্পন্ন চাষী আছে। তার সাহায্যে প্রত্যেকখানা গ্রামের সম্পন্ন চাষীদের নিয়ে একটা দল তৈরী করিয়েছি। তাদের সাহায্যের জন্যেও কিছু লাঠিয়াল পাঠিয়ে দিয়েছি। নদীতীরে তাদের কারো কারো

অনেক জমি আছে। যেখানেই বাঁধের জন্য সেই সমস্ত জমিতে অনধিকার প্রবেশ হবে সেখানেই যাতে একটা ক'রে দাঙ্গা বাধে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

—সোনায় সোহাগা।—লাফিয়ে উঠলেন ধাড়া, আমি তাহলে পুলিশ ফোর্স নিয়ে এইবার ঝাঁপিয়ে পড়ি। 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে'।

দ্রুতপদে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খাল কাটার কাজ চলছিল পুরোদমে।

সোমনাথ একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছে। তার দেহ এখনো দুর্বল। কাজের তত্ত্বাবধান করছে শশী আর তিনু মোড়ল।

হঠাৎ দূরে একটা শব্দ উঠল—রে! রে! রে! রে!

—একি, লেঠেল আসে কোথা থেকে?—বিস্মিত শশী ব'লে উঠল।

মুহূর্তমধ্যে সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে পথের দিকে তাকাল কৌতূহলী হয়ে। সোমনাথ একটা গাছের ছায়ায় বসেছিল রৌদ্রের উত্তাপ এড়িয়ে। বাতাসের নিঃশ্বাসে বনস্পতির শাখা-প্রশাখা দুলছিল।

সেই স্নিগ্ধ হাওয়ায় ব'সে সে এই কথাই ভাবছিল, বাধা কোন দিক থেকে আসবে ?

সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে বললে, বোধ হয় জমিদারের লাঠিয়াল। তোমরা তৈরী হও। আমরা ওদের বাধা দোব।

মুহূর্তের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল। জমিদার যে নিস্ক্রিয় হয়ে ব'সে থাকবে না, সেকথা পূর্বেই তারা অনুমান করেছিল। তাই কোদাল, সাবল, গাইন্তির সঙ্গে লাঠিও এসেছিল।

—দলবল ঠিক করে নাও মোড়লের পো। লড়তে হবে।—শশী বললে।

—লড়তেই ত এয়েচি।—তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনু মোড়ল বললে, তোমার হাতে লাঠি কই ?

—তুমি হলে মোড়ল, তুমি না বললে লাঠি নিই কি ক'রে ? শশী বললে।

—বেশ। তাহলে চুপ ক'রে থাকো। দেখ, আমি কি করি।

মুহূর্তমধ্যে তিনুর চেহারা যেন বদলে গেল। সে বললে, যে যেমন কাজ করছ কর, শুধু পঁচিশজন জোয়ান এগিয়ে এস এখানে। দেরী না হয়।

লাঠিয়ালদের চীৎকার সন্নিকটবর্তী। পঁচিশজনের অনেক বেশী লোক উঠে এসেছিল। গণবার সময় হ'ল না। তিনু বললে, লাঠি নাও, মরদ।

সামনেই এককড়িকে দেখা গেল। তার পিছনে লাঠিয়ালদের দল। মালকোঁচা বাঁধা নিকষ কালো দীর্ঘ চেহারা। তাদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। ঘর্মাক্ত মুখগুলো দেখাচ্ছে বীভৎস।

—এখানে তোরা কি করছিস রে ?—হুঙ্কার দিলে এককড়ি।

—ফলার করছি নায়েব মশাই। এসনা, এক পাত হয়ে যাক্।—ব্যঙ্গের সুরে কথা বললে তিনু।

—বটে। তিনু মোড়ল না? ডাকাত ব্যাটা, এখানে কি করছ? দাঁড়াও, তোমাদের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।—চীৎকার ক'রে উঠল এককড়ি।

তিনু কি বলতে যাচ্ছিল, সোমনাথ অগ্রসর হয়ে এসে তাকে বাধা দিলে। বললে, বাজে কথার দরকার নেই।

এককড়ির সামনাসাম্‌নি এসে দাঁড়াল সে। বললে, আমার সঙ্গে কথা বলুন। কি চান্ আপনি?

—কি চান্ আপনি?—বিদ্রূপ করে উঠল এককড়ি, 'যার ধন তার ধন নয়, আর নেপোয় মারে দই?' বেড়ে কথা তো? জমিদারের খাস জমিতে অনধিকার প্রবেশ ক'রে আপনার দলবল খাল কাটছে, আর আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করছেন, কি চাই? আমি আপনার দলবলকে বাধা দিতে চাই। এ জমিতে খাল কাটতে আমি দোবনা।

কথা বলতে বলতে লাঠিয়ালদের ইঙ্গিত করলে এককড়ি।

—খাল আমরা কাটবই। আপনার বাধা আমরা মানব না।

গম্ভীর কণ্ঠে সোমনাথ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একসঙ্গে পঞ্চাশখানা লাঠি উদ্যত হয়ে উঠল। এককড়ি চীৎকার করে বললে, বাধা মানবে না তো চুলোয় যাও।

লাঠিয়ালদের চীৎকারে এককড়ির কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

একসঙ্গে অনেকগুলো লাঠি এসে পড়ছিল সোমনাথের মাথার ওপরে। শশী তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে শশী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। রক্তে মাথাটা উঠল লাল হয়ে।

—শশী!—ব্যথিত কণ্ঠে সোমনাথ চীৎকার করে উঠল।

কিন্তু সে চীৎকার শোনবার অবসর তখন আর কারো ছিল না। দু'দলই তখন দু'দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

লাঠির শব্দে, আহতের আর্তনাদে সেই খণ্ডযুদ্ধ ভয়াবহ হয়ে উঠল। সোমনাথের দলের পক্ষে প্রতিরোধের সুবিধা ছিল। তারা ছিল বনের মধ্যে। পথ সেখানে নিতান্ত স্বল্পপরিসর, নেই বললেই হয়, আর এককড়ির দল বনের সম্মুখে, পথে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে এককড়ির দল পিছু হটতে লাগল। সঙ্কীর্ণ স্থান থেকে বনশ্রী গ্রাম রক্ষা সমবায়ের এক একজন লাঠিয়াল একা লড়তে লাগল প্রায় দশজনের বিরুদ্ধে।

পিছনে ধাত্রী। চপল চঞ্চল গতিতে বয়ে চলেছে।

—আমাদের চুলোয় পাঠাচ্ছিলে না? নিজেরা এবার নদীতে ডুবে মর।—হুঙ্কার দিলে তিনু মোড়ল।

এককড়ি পিছনে চেয়ে দেখলে। তিনুর কথাই সত্য। কিন্তু তখন আর তার দলকে ফেরাবার পথ নেই। দুপক্ষই মরিয়া হয়ে লড়ছে। তিনু মোড়লের দল নেমে এসেছে পথে, বনভূমি ছেড়ে। আর তার দল পিছু হটছে নদীগর্ভের দিকে।

মনে মনে প্রমাদ গণলে এককড়ি। সেই মুহূর্তে যুদ্ধও উঠল প্রচণ্ড হয়ে। এককড়ির দলও উপলব্ধি করছিল যে এইভাবে লড়লে নদীতে ডুবে মরতে হবে। তারা সুশিক্ষিত লাঠিয়াল। দাঙ্গায় পরাজয় কি বস্তু তা জানে না। কিন্তু রাজার গাঁয়ের বাগ্দীদের তারা চেনে। লাঠি চালনায় তাদের খ্যাতি অপরিসীম। তার ওপর ওরা সংখ্যায় পঞ্চাশ জন। বিপক্ষদলে শ'দুই লোক। প্রথমে তিনু পঁচিশজন লোক নিয়ে লড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও যুদ্ধের সময় সকলেই এগিয়ে এসেছিল। লাঠির অভাবে কোদাল শাবল নিয়েও যুদ্ধ হচ্ছিল।

লাঠিয়ালদেরও ভুল হয়েছিল। রাজার গাঁয়ের বাগ্দী কয়েকজন মাত্রই ছিল। আর সব ছিল ভিন্ন গ্রামের লোক। কিন্তু কয়েকটি পরিচিত মুখ দেখে তারা ভাবলে সকলেই রাজার গাঁয়ের।

নিজেদের অবস্থা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করবার পর যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল। জমিদার পক্ষের লাঠিয়ালরা রচনা করলে দুর্বার আক্রমণধারা। বনশ্রী গ্রাম রক্ষা সমবায়'কে পিছু হ'টে আসতে হল।

নদীতীর থেকে পথে উঠে জমিদার পক্ষের লাঠিয়ালরা কিন্তু অগ্রসর হ'ল না। তারা ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে বাঁকতে আরম্ভ করলে।

—ওরা পালাচ্ছে!—তিনু চীৎকার ক'রে উঠল।

—পালালে আর লড়বার দরকার নেই।—ক্লান্ত কণ্ঠে সোমনাথ বললে।

—বলেন কি? এমন তাল ছেড়ে দোব? অন্ততঃ নায়েব ব্যাটার একখানা ঠ্যাঙ চিরকালের জন্যে জখম করে দিই? একটা চিহ্ন থেকে যাক।—হাঁফাতে হাঁফাতে তিনু বললে।

—না তিনু। আমরা শুধু ওদের বাধা দিচ্ছি, এই কথাটি মনে রেখো।

জমিদার পক্ষ রণে ভঙ্গ দিলে। এককড়ি ছুটলো সর্বাগ্রে। তার পিছনে পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল। এবারে আর সেই শব্দ নেই, রে! রে! রে! রে!

—আহতদের আগে দেখো তিনু!—আদেশ দিলে সোমনাথ। সে নিজে বসল শশীর মাথা কোলে করে। নিজের কাপড় ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে তার মাথায়। শশী অচেতন। তার আঘাত গুরুতর।

আহত অনেকেই হয়েছিল, তবে আঘাত বিশেষ গুরুতর নয়। তাদের সকলের প্রাথমিক শুশ্রূষা শেষ ক'রে সোমনাথ কয়েকজনের সাহায্যে অচেতন শশীকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। তারপর তিনুকে বললে, আজ আর নয়, কাল থেকে আবার কাজ আরম্ভ হবে। আরো গুরুতর বাধার জন্যে তৈরী হয়ে থেকো তিনু।

—সব কিছুর জন্য তিনু তৈরী আছে। আপনি ভাববেন না।

হাসল তিনু।

সোমনাথকেও আঘাত লেগেছিল। কয়েক ঘা লাঠির চোট। প্রথমটা আঘাতকে অবহেলা করলেও এখন সে যন্ত্রনা বোধ করতে লাগল। দেহের স্থানে স্থানে ফুলেও উঠেছিল।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে পথে এসে দাঁড়াল। এবার তাকে একবার সন্ধান নিতে হবে গৌরীর। সেখানে কি হচ্ছে।

শ্রীচরণ গ্রামের সীমানাতেই অনন্ত দাস আর একটা দাঙ্গা বাধালে। অভিযোগ এই, মাটি কেটে অনন্ত দাসের জমিতে ঢালা হচ্ছে।

অল্পক্ষণেই রণে ভঙ্গ দিতে হল তাদের। এখানে বনশ্রী গ্রাম রক্ষা সমবায় দলে আরো ভারী। তার উপর জনার্দন এখানে উপস্থিত।

লাঠির চোটে জনার্দন প্রথমেই ঘায়েল করলে অনন্ত দাসকে। পলায়মান অনন্ত দাস দৌড়ুতে দৌড়ুতে শাসিয়ে গেল, আমি ফৌজদারী করব।

—তার আগে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে তোমাকে নদীতে ভাসিয়ে দোব।—জনার্দন বললে দাঁতখিঁচিয়ে।

গৌরী স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল পাথরের প্রতিমূর্ত্তির মত।

উদ্বেগ ও আনন্দ দুটি ভাবই তার মনে তখন পাশাপাশি বিরাজ করছে। অনন্ত দাসের দাঙ্গা বাধানোতে যার সুরু হল, তার পরিণতি কি ভাবে আসবে সেই ভেবে সে উদ্বিগ্ন। আনন্দের হেতুও আছে। কাজ আরম্ভ করেছে সে বিপুল উদ্যমে, অদম্য উৎসাহে।

এমনি সময়ে এসে পৌছুল সোমনাথ।

গৌরী হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল তাকে দেখে।

ক্লান্তিতে সোমনাথের দেহ ভেঙে পড়ছিল। তবু স্থির হয়ে গৌরীর কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ সে নিলে। নিজেদের সংবাদও দিলে। শশীর আঘাতের কথা শুনে গৌরীর উদ্বেগ আরো বেড়ে গেল।

—আমার মন খুব অশান্ত হয়ে উঠছে গৌরী। কেন, তা বুঝতে পারছিনা। পণ্ডিত মশাই এখনো ফিরলেন না কেন?

—আমিও ভাবছি তাঁর কথা।—গৌরী বললে, তাঁর তো অনেকক্ষণ আগেই ফেরা উচিত ছিল।

এখানকার কাজও আজকের মত বন্ধ হয়ে গিছল। কাল ভোর থেকে আবার সকলে সুরু করবে এই স্থির হয়েছিল।

সকলে চলে যাওয়ার পর গৌরী জনার্দনকে ডেকে বললে, তুমি শশীর ওখানে যাও। জেলেপাড়ায় ব'লে নৌকো তৈরী রেখে যেও। দরকার বুঝলে, তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে হাঁসখালি যেতে হবে চিকিৎসার জন্যে। স্বরূপনগর থেকে ডাক্তার আসবে না। জমিদারের ভয়ে সে কাঁপে। আমরাও এখনি আসছি।

জনার্দন চলে গেলে ধাত্রীর তীরে দুজনে বসল পাশাপাশি। এতক্ষণ পরে গৌরীর দৃষ্টি পড়লো সোমনাথের দিকে। বললে, তোমার একটা চোখ যে অসম্ভব ফুলে উঠেছে। চোখের নীচে কালসিটেও পড়েছে।

—চোট খেয়েছি।

হাসল সোমনাথ। বললে, দেহের স্থানে স্থানে আরো চিহ্ন আছে।

—তাহ'লে তুমি বাড়ী গেলে না কেন?—গৌরীর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা।

—বাড়ী যাওয়ার আগে তোমার সংবাদটা নোব না?—স্নিগ্ধ কণ্ঠে সোমনাথ বললে।

—বাড়ীতেই তো দেখা হত। মিছিমিছি যন্ত্রণাভোগ করতে করতে এতখানি পথ এলে?

—মিছিমিছি নয়, সত্যি সত্যি।

—সে যাই হোক, এবার চল।

উঠে দাঁড়াল গৌরী।

—একটু বসবে না?—সোমনাথের কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী।

—না, একেই তুমি এখনো দুর্বল। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন সবচেয়ে আগে।

তার কণ্ঠস্বর মমতায় আর্দ্র।

তারা কয়েক পা এগোতে না এগোতেই দেখতে পেলে জনার্দন ফিরে আসছে। তার পিছনে অবগুণ্ঠিতা এক নারী।

কোন প্রশ্ন করবার আগেই জনার্দন বললে, লিচু এসেছে দেবী। তোমায় বাড়ীতে, এখানে-সেখানে অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে পায়নি। শেষে কার কাছে সংবাদ পেয়ে এইদিকে আসছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। বলছে, কি জরুরী কথা আছে।

লিচুর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল গৌরীর মুক্তি পাওয়ার পরেই। সেই রাত্রিতে লিচুই তাকে বাঁচিয়েছিল ভীষণ বিপদ থেকে, সেকথা জানতে পেরে তার প্রতি গৌরীর কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করলে স্নিগ্ধকণ্ঠে, কি হয়েছে লিচু?

অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে লিচু বললে, পণ্ডিতকে পুলিশে ধরেছে খবর পেয়েছ কি ?

—না। কখন ধরেছে ?—উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল গৌরী।

—আজ, বেলা তখন দশটা হবে। ইষ্টিশনে।

—কেন ?

সোমনাথের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না লিচু।

—আমি এখানে এসেছি আরো একটু দরকারে।—কুণ্ঠিত কণ্ঠে লিচু বললে।

—এখানে বলতে কোন বাধা নেইতো ?

—না, বাধা কিছু নেই।

গৌরীর কথার উত্তরে হাসল লিচু, পণ্ডিতকে পুলিশে ধরেছে, আরো অনেককে ধরবে।—তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে, তোমরা যে কাজে হাত দিয়েছ তাতে অর্থের প্রয়োজন যথেষ্ট। আমি যদি কিছু সাহায্য করি, নেবে কি ?

—কেন নোব না ?—স্মিতমুখে গৌরী বললে।

লিচুর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেলে গভীর সঙ্কোচ। বার দুই গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে সে যেন মনে দৃঢ়তা আনবার চেষ্টা করলে। তারপর একসময়ে প্রায় মরিয়া হয়েই বলে ফেললে, আমার পয়সা পাপের পয়সা দেবী, তাই আমার ভয় ছিল, সে পয়সা হয়ত তুমি নেবেনা। মহাপাপী আমি, তোমার খবর যেদিন পণ্ডিতকে দিতে আসি, সেদিনই আমার মন কেমন হয়ে গিছল। জমিদার তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে দেখে, আমার অস্বস্তির আর শেষ ছিল না। মনে হচ্ছিল, এ পাপ সইবে না। তাই দুঃসাহসে বুক বেঁধে তোমাকে উদ্ধার ক'রে আনবার উপায় বলে দিতে এসেছিলুম।

—সেজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।—গৌরী বললে।

—কৃতজ্ঞ তুমি হবে কেন? আমিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। জীবনে একবার সৎকাজ করবার সুযোগ আমি তোমার জন্যই পেলুম। কিন্তু সেদিন আরো সুযোগ আমি পেয়েছিলুম। আমার মোহ তখনো কাটেনি, তাই সে সুযোগ নিতে পারিনি। পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার বিবেক যখন জেগেছে তখন এবার থেকে বিবেককেই অনুসরণ করো।' তা পারিনি। কাল রাত্রিতেও আমার ঘরে লোক এসেছিল, আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি।

গভীর লজ্জায় গৌরী মুখ নত করলে।

তার দিকে চেয়ে লিচু বললে, অপরাধ নিয়োনা দেবী। অসৎ-কর্ম আমি আজীবন করেছি, আমার জন্ম পর্যন্ত অসৎ-সহবাসে। যদি অসঙ্গত কথা কিছু বলে ফেলি তো রাগ করো না।

—না, রাগ করিনি।—গৌরী বললে, তবে একটা কথা বলি, যদি পারো তো, কর্মের দিকটায় লক্ষ রেখো। অসৎ-সহবাসে জন্ম তো অনেকেরই হয়।

লিচু বিস্মিত হল, গৌরীর গলা কেঁপে উঠছে।

সোমনাথ গৌরীর মনোযোগ আকর্ষণ করলে। বললে, আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। শশীর ওখানে যেতে হবে।

– হ্যাঁ।—গৌরী চঞ্চল হয়ে উঠল।

লিচু বললে, আর সামান্য সময়ই আমি নোব। কর্মের দিকে লক্ষ রাখব বলেই মনঃস্থির করে বেরিয়েছি। লোভই আমার সব চেয়ে বড় শত্রু। অর্থের লোভ, গয়নার লোভ, বাড়ীর লোভ। তাই সেই সমস্ত তোমাকে আজ দিতে এসেছি দেবী। তুমি নাও। আমাকে লোভমুক্ত করো।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল গৌরী।

লিচুর হাতে একটা পুটুলি ছিল। সেটা গৌরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বললে, এতে আমার সমস্ত গয়না আছে, সঞ্চিত অর্থ আছে শুধু কাগজের নোটে, আর বাড়ীর দানপত্র আছে। ভাল উকিলকে দিয়ে দানপত্র করিয়ে এনেছি।

—কিন্তু তুমি যে ভিখিরি হয়ে গেলে লিচু?- গৌরী বললে।

—এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ আমার আর নেই। এগুলো থাকলেই আমার আরো উপার্জন করবার লোভ জাগবে। তাই সর্বস্ব খুইয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমার স্বামী নেই, ছেলে নেই, আপনার বলতে কেউ নেই। এগুলো তুমি যাদের জন্যে ব্যয় করবে, তাদেরই আমি ভাবব আমার আপনার বলে।

কাঁদতে লাগল লিচু।

গৌরী পুটুলি হাতে ক'রে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে লিচু বললে, আমি বাঁচলুম দেবী। আমার আজীবনের উপার্জন তোমাকে দিয়ে গেলুম। বোধ হয়, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি আজই স্বরূপনগর ছেড়ে যাচ্ছি।

—কোথায় যাবে?

—জানি না। একটা কথা শুধু তোমাকে বলে যাই। সাবধানে থেকো। জমিদার আর ধাড়া বাবু ভীষণ তোড়জোড় আরম্ভ করেছে। সব কথা আমি জানি না, জানলে বলতুম।

—আমরা যে কাজে নেমেছি, তাতে সাবধানতা ব'লে কিছু নেই। —গৌরী বললে, যাই হোক, আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

—তাই যাও দেবী, ভগবান তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

আর দাঁড়াল না লিচু।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেউ আর কাজে বেরোবার অবকাশ পেলে না। শাঁখও বাজল না। নির্মম অত্যাচারে পনেরখানা গ্রামের হৃদ্‌স্পন্দন পর্যন্ত যেন থেমে গেছে। ধাড়ার নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রত্যেকখানা গ্রামে।

সাইক্লোন, বন্যা বা ভূমিকম্প নয়, মানুষের অত্যাচার! তবু এক রাত্রিতেই গ্রামগুলো তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল।

যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতা! পাশবিক প্রতিহিংসা!

অক্ষয় পণ্ডিতের বাড়ী দাউ দাউ করে আগুণে পুড়ছে। পুড়ছে প্রত্যেকখানা গ্রামের গ্রাম-পঞ্চায়েতদের ঘর। ভূমিহীন কৃষকেরা প্রহারে জর্জরিত। প্রত্যেকের ঘরে সঞ্চিত ধান ও চাল যা ছিল, ধাড়া ক্রোক করে এনেছেন। যার ঘরে দু'বস্তা চাল ছিল, সেও রেহাই পায়নি।

—না খেতে দিয়ে এদের কম্যুনিজম ভোলাব, বুঝলে সেন?

—বুঝেছি স্যর। আমার কিন্তু মনে হয়, কম্যুনিজম জিনিষটা ওদের কেউ বোঝে না।

—বোঝে, বোঝে। ওরা না বুঝলেও ওদের নেতারা বোঝে। দেখছ না, কোথায় সেই ছোঁড়াটাকে আর মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে,

এমন সাংঘাতিক নির্যাতনেও সে কথা প্রকাশ করছে না? এখনো পুরোদস্তুর শিক্ষা হয়নি ওদের। ওই হারামজাদা ব্যাটাদের চেন না তুমি। না খাইয়ে রাখো ওদের, ছেলে বুড়ো সব। দেখি প্রকাশ করে কি না, কোথায় আছে সে দুটো। তাদের ধরতেই হবে।

—চেষ্টা তো করছি স্যর, প্রাণপণে।—সেন বললে।

—হ্যাঁ, তাই করো। মনে রেখো, তোমার প্রমোশন নিশ্চিত।

সেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বললে, ধরবই তাদের। গ্রামগুলো চষে ফেলব। বাড়ীগুলো মাঠ হয়ে যাবে। লুকোবে কোথায়?

—তাই করো সেন! বহু চেষ্টায়, বহু যত্নে আমি এই ব্যাপারটাকে একটা কম্যুনিষ্ট মুভমেণ্ট বলে খাড়া করেছি। হেডকোয়ার্টার শুধু আমাকে বিশ্বাস করেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। এই সাজানো ব্যাপারটা তাসের ঘরের মত ভেঙে গেলে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। শুধু তাই নয়, আরো গুরুতর কিছু হতে পারে। যে কোন মূল্যে আমাকে শেষ রক্ষা করতে হবে।

—ভাবছেন কেন স্যর?—তোবামোদের ভাষায় সেন বললে, —শেষরক্ষা এই ত প্রথম করছেন না। এর পূর্বেও তো বহুবার সাজানো কেস্ উৎরে দিয়েছেন। এবারেও সব ঠিক হয়ে যাবে।

— না হে, অতটা সহজ নয়। তখনকার সরকার আর এখনকার সরকার এক নয়। আন্দোলনকারীরা সরকারের যতই নিন্দা করুক, সরকার চাষীদের প্রতি যতটা সহানুভূতিসম্পন্ন, জমিদার বা ধনীদের প্রতি ততটা নয়। এটা ভিতরের কথা, বাইরের লোক না জানলেও আমরা জানি। আমরা যেটুকু প্রভাব প্রতিপত্তি এখনো বজায় রেখে চলেছি, সে শুধু উপরওয়ালাদের অনভিজ্ঞতার জন্যে। আমাদের জারিজুরি বেশি দিন চলবেনা সে আমি তোমাকে এখন থেকেই বলে রাখলুম। ভালো কথা, শশীর কাছ থেকে কোন কথা বার করতে পারলে?

—সে সত্যিই কিছু জানে না।—সেন বললে, এরা যখন আত্মগোপন করেছে, মাথার গুরুতর জখমে সে তখন অচেতন।

—তার ব্যবস্থা কিছু করেছ ?

—স্বরূপনগর হাসপাতালে পাঠিয়েছি। সেও আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তাকে ছেড়ে রাখা চলে না।

—ভালোই করেছ।—গোঁফে চাড়া দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন ধাড়া। বললেন আমি একবার স্বরূপনগরে যাচ্ছি। ফিরতে বেশী দেরী হবে না। চব্বিশঘণ্টা সময় আমি তোমাকে দিলুম। এর ভিতর পলাতক দুজনকে খুঁজে বার করতেই হবে।

অল্‌রাইট্‌ স্যার ;—সেন স্যালিউট করলে।

গভীর রাত্রি। চতুর্দিক স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। বিনিদ্র গ্রামগুলিতে আতঙ্ক যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুহূর্তগুলো বয়ে যাচ্ছে না, প্রত্যেক লোকটির বুকে যেন চেপে বসছে ভারী পাথরের মত। কারো নিদ্রা আসেনি। রুদ্ধশ্বাসে সবাই নিঃশব্দ হয়ে আছে।

একখানা মাটির ঘরে সোমনাথ আর গৌরী বসে আছে মুখোমুখি।

গৌরী বলছিল, এ আর সহ্য হয় না। আমরা ধরা দিলেই যদি অত্যাচারের শেষ হয় তো চল ধরা দিই।

মৃদু কণ্ঠে কথা হচ্ছিল। বাইরে জনার্দন ব'সে। তার কালো দেহটা সেখানকার অন্ধকারকে আরো ঘন করে তুলেছে।

সোমনাথ বললে, ধরা দেওয়ার কথা আমিও ভাবছি। কিন্তু তোমার ধরা দেওয়া চলবে না।

—তবে কি শুধু তুমি ধরা দেবে? সে কি হয়?

—তাই হতে হবে গৌরী। ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করলে চলবে না। পুলিশ দুদিন না হয় চারদিন বাদে এখান থেকে চলে যাবে। তখন এই অসহায় নির্যাতিত মানুষগুলোকে দেখবে কে? কে

তাদের সান্ত্বনা দেবে? অসম্ভব সাধনায় যে পনেরখানা গ্রামে নিজের কর্মক্ষেত্র তৈরী করলে, সে ক্ষেত্রকে অযত্নে ফেলে রাখলে তোমার সাধনাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—কিন্তু তুমি ধরা দিতে চাইছ কেন?

—পুলিশকে কতকটা সন্তুষ্ট করবার জন্য। দু'জনের একজনকে পেলেও আপাতত তাদের উদ্যম কতকটা শিথিল হবে। ইতিমধ্যে তোমাকেও বাইরে চ'লে যেতে বলছি।

—কোথায়?

—বেড়া-জালের মধ্যে পুলিশ ঘিরে রেখেছে পনেরখানা গ্রাম। সেই জালের বাইরে। ওদের পাহারা শিথিল হ'লেই তুমি আসা-যাওয়া করতে পারবে। আর তোমার আসা-যাওয়ার প্রয়োজনই এখন সব চেয়ে বেশী।

—সোমনাথ!—গৌরীর কণ্ঠে আর্তনাদ। সে তার একখানা হাত চেপে ধরলে।

—ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হ'লে চলবে না গৌরী।—সোমনাথ বললে দাঁতে দাঁত চেপে। সে যেন অমানুষিক প্রচেষ্টায় আত্মসম্বরণ করছিল, দুজনে ধরা দিলে পুলিশের অত্যাচার কমবে, কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়ব। যেটুকু এগিয়েছি সেখান থেকে পিছু হটে এলে চলবে না। এই পনেরখানা গ্রাম হয়তো ভবিষ্যতে আটচল্লিশলক্ষ গ্রামের দৃষ্টান্তস্থল হয়ে উঠবে। আমাদের আদর্শও তো তাই। সার্থক পদক্ষেপ যেন শেষে পশ্চাদপসরণে পরিণত না হয়, এই আমার অনুরোধ। তোমাকে এ অনুরোধ রাখতেই হবে।

গৌরী স্তব্ধ হয়ে রইল। সোমনাথের হাতে ঝ'রে পড়ল কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজল।

সোমনাথ তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে। বললে, আমি যা বলছি, তোমার গুরুদেব এখানে উপস্থিত থাকলে তিনিও তাই বলতেন, এমন কি পণ্ডিতমশাই পর্যন্ত।

—বেশ, তুমি যা বলছ তাই হবে। আমি এখন কোথায় যাব তার কিছু কি ভেবে রেখেছ?

—রেখেছি। মাছ ধরার নৌকো ক'রে জনার্দন তোমাকে নিয়ে যাবে হাঁসখালি। তোমাকে সেখান থেকেই এখানকার গ্রামে গ্রামে যাতায়াত করতে হবে আত্মগোপন ক'রে। অবশ্য পুলিশের কড়া নজর একটু শিথিল হলে।

আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে গৌরী বললে, আমি রাজি। তুমি আজই ধরা দাও। অসহায় মানুষগুলোর কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—আমি আজই ধরা দোব গৌরী। তবে এখন নয়, তুমি নিরাপদে নৌকোয় উঠলে। ধাত্রীর বুকে পুলিশের লঞ্চ আছে সেকথা ভুললে চলবে না।

—নির্বিচারে আমি আজ তোমার কথাই শুনব।—গৌরী বললে।

—তাহলে এখনি তৈরী হয়ে নাও। জনার্দন তোমার সঙ্গে যাবে। ও হাঁসখালিতে তোমার কাছেই থাকবে।

—এখনি?—গৌরীর গলা কাঁপছিল।

—হ্যাঁ।

উঠে দাঁড়াল গৌরী। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বললে, সোমনাথ, তুমি পুরুষ আর আমি নারী। এখানকার অসহায় মানুষগুলির জন্য আমরা দুজনেই নিজেদের উৎসর্গ করেছি। এ ছাড়া আরো একটা সম্বন্ধ তোমার আমার মধ্যে আছে! যদিও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন বন্ধনে আমরা আবদ্ধ নই। গুরুদেব বলেছিলেন, ইন্দ্রিয়ের স্থূল সম্পর্ক এড়িয়ে আত্মার সঙ্গে আত্মার সূক্ষ্ম সম্বন্ধ যারা পাতাতে পারে তারাই পায় অনির্বচনীয়

আনন্দ। সেই আনন্দের রোমাঞ্চ আমার মনে। তুমি কথা দাও, সে আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে না ?

—না।—সোমনাথ বললে, আমার জীবনে দুই নারী। প্রথমা শিপ্রা আর দ্বিতীয়া তুমি। তোমার সঙ্গে বন্ধনের সম্বন্ধ পাতাব না। তোমাকে কেন্দ্র করে আমি অনুভব করব বন্ধনমুক্তির শিহরণ। দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো যায় কিনা আমি তা জানি না। যদি যায়, তুমি সেই চেষ্টা করো। আমার দিক থেকে একটুও বাধা আসবে না। আমার মানসলোকের সমুজ্জ্বল তারা তুমি, তোমার দৃষ্টির প্রদীপে আমি পথ দেখে চলব, তরঙ্গ-ভঙ্গে দেহতট আমাকে বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ করতে পারবে না। এই আমার প্রতিশ্রুতি। আর দেরী নয় গৌরী।

—আমি প্রস্তুত।—গৌরী বললে।

জনার্দনকে সংক্ষেপে উপদেশ দিলে সোমনাথ। বললে, দেবী নিরাপদে নৌকোয় উঠলেই যেন আমি সংবাদ পাই।

—জেলেদের যে-কেউ এসে খবর দিয়ে যাবে।

গৌরী বেরিয়ে পড়লো জনার্দনের সঙ্গে। আর সোমনাথ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অন্ধকারে। তার চোখের সামনে অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিপ্রা।

ক্ষণকালের সীমা পার হয়ে সে চলে গেছে। গৌরী, সেও কি গেল ?

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে সোমনাথ চকিত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে সেই ঘন অন্ধকারে সে দেখতে পেলে অস্পষ্ট একটা অবয়ব। চাপা কণ্ঠে বললে, কে ?

—আমি ক্ষান্ত।

—এস।—গম্ভীর কণ্ঠে বললে সোমনাথ।

ঘরে এসে বসল ক্ষান্ত।

—আমি সমস্ত খবরই পেয়েছি। রাজার গাঁয়ে পুলিশ ভীষণ অত্যাচার করছে।—সোমনাথ বললে।

গাঁয়ের ছেলেরা বলছে, 'ক্ষেন্তিদি, তোমার কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না।' আমি তাদের কথা শুনে এত দুঃখেও হেসে মরি। রাধানাথকে বলতুম, ঠাকুর তুমি আমাকে পাথর করো। দেখছি তিনি আমাকে দিয়ে পাথরের মতোই সমস্ত সইয়ে নিলেন।

কথা কয়বার একটা সূত্র খুঁজে পেলে সোমনাথ। সে বললে, ছেলেরা ঠিকই বলছে।

—তা জানি।—ক্ষান্ত বললে, কিন্তু পাথরও তো ভাঙে ?

—ভাঙে বৈকি। তবে তার আগে অনেক আঘাত সহ্য করে। সে কথা ভুলে যেও না।—সোমনাথ বললে।

—ভুলিনি দাদা। পুড়ে ছাই হয়েছেন আমার রাধানাথ। তবু তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। বিগ্রহের মধ্যে যাঁকে আমি উপলব্ধি করতুম, করতুম যাঁর পূজা তাঁর ছাই বাতাসে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার ইষ্ট আজ আর বিগ্রহের সীমাবদ্ধ আধারের মধ্যে নেই। রাজার গাঁয়ের আকাশে বাতাসে তিনি আজ ব্যাপ্ত। স্পর্শ করছেন সেখানকার আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে। পবিত্র করছেন সেখানকার মাটিকে।

—ঠিক কথা।—উল্লসিত হয়ে উঠল সোমনাথ। এই তো ক্ষান্ত'র প্রকৃত পরিচয় ! কোন আঘাতেই সে টলে না। অটল স্থিরতা নিয়ে চেয়ে থাকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দূরবর্তী লক্ষের দিকে। সে বললে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম !" গোটা রাজার গাঁ আজ তোমার কাছে ব্রহ্মময়। সেখানে প্রতি অণু পরমাণুতে মিশে আছেন তোমার রাধানাথ। এই উপলব্ধি যখন এসেছে তখন আর দুঃখ কিসের ক্ষান্ত ?

—দুঃখ তো করিনি। শুধু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে বুকের ভিতরটা আমার একেবারে খালি হয়ে গেছে।

—মনে না হওয়াই আশ্চর্য। তবে শূন্যতাকে নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। ভিতরের সেই ফাঁকটুকু যে কোন উপায়ে ভরিয়ে তুলতে হবে।

—তাতে লাভ কি ?

—লাভ তোমার না থাকতে পারে আমাদের আছে। রাজার গাঁয়ের লোকেরা, বনশ্রী গ্রামরক্ষা সমবায়ের কর্মীরা তোমার বেঁচে থাকাটা প্রার্থনীয় বলে মনে করে ক্ষান্ত। আমাদের জন্য তুমি বাঁচবে। যেমন করে নটবরকে ছেড়ে বেঁচেছিলে রাধানাথকে নিয়ে, তেমনি করেই তোমাকে এবার বাঁচতে হবে আমাদের নিয়ে।

—আমার নটবর আর রাধানাথ যে এক হয়ে গিছল দাদা ?

—বেশতো।—স্নিগ্ধকণ্ঠে সোমনাথ বললে, দৃষ্টি আরো প্রসারিত হোক। সেই রাধানাথের মধ্যে আমরাও বিলীন হয়ে যাই। এই এক করে নেওয়ার শক্তি তোমার আছে বলেই আমি বলছি ক্ষান্ত, রাজার গাঁ আর বাকী গ্রামগুলোকে অবলম্বন করেই এখন তোমাকে বাঁচতে হবে। তোমার রাধানাথ এখন সব-দিকে। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তিনি বিরাজমান।

—সেই প্রশ্ন নিয়েই আজ এসেছিলুম আপনার আর দেবীর কাছে। ঠাকুর পুড়ে যাওয়ার পর থেকে মনে মনে তাঁকে আমি রোজই জানাচ্ছি, রাজার গাঁয়ের প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যেও যে তুমি আছ সেই কথা উপলব্ধি করবার শক্তি আমাকে দাও। সেখানকার গ্রামবাসিদের সেবা করলেই তোমার সেবা করা হবে এই সত্য আমি যেন অনুভব করতে পারি। তাদের দুঃখই আমার দুঃখ। তাদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল।

—এর চেয়ে বড়ো প্রার্থনা আজকের দিনে আর নেই ক্ষান্ত।—সোমনাথ বললে।

—দেবীর সঙ্গে তো দেখা হ'ল না। আপনার উপদেশ নিয়েই চললুম।—উঠে দাঁড়াল ক্ষান্ত। বললে, মনের জ্বালা অনেকটা কমে গেল।

ক্ষান্তর গভীর আত্মবিশ্বাস আর একবার চমৎকৃত করলে সোমনাথকে। সেও উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি রয়েছি এক অনিশ্চিত-

অবস্থার মধ্যে। দেবীকে ইচ্ছা করেই এখান থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই অবস্থায় তুমিই আমার প্রধান ভরসা। রাঙা-চোখ আর লাঠিবাজী আমাদের আন্দোলনকে মারতে পারবে না। চাকা ঘুরবেই। বিক্ষুব্ধ চাষীরাই করবে নতুন দিনের গোড়াপত্তন। সেইজন্যই সমস্ত আঘাত সহ্য করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমার এই কথাটি মনে রেখো ক্ষান্ত।

—রাখব।

—আর একটা কথা। তোমাকে পরিষ্কার করেই বলি আজকের ভোরেই আমি পুলিশের হাতে ধরা দোব বলে ঠিক করেছি।

—সে কি? আমরা থাকব বাইরে আর আপনি ধরা দেবেন?

—তাছাড়া আর কোন উপায় নেই ক্ষান্ত। আমি ধরা না দিলে পুলিশের অত্যাচার কমবে না। আমি ধরা দিই, দেবীরও তাই ইচ্ছা। সুতরাং এই নিয়ে তোমরা আর বাধা দিয়ো না। তোমাদের চিন্তার কিছু নেই। দেবী তোমাদের সঙ্গে সংযোগ রাখবে। তার কাছ থেকে তোমরা কাজেরও নির্দেশ পাবে। আমার আর দেবীর অবর্তমানে নেতৃত্ব থাকবে তোমারই হাতে। সে কথা সবাইকে আমি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছি।

—সবই রাধানাথের ইচ্ছা।

ক্ষান্ত প্রনাম করলে। বললে, দুটি ছেলে বাইরে আমার অপেক্ষায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে। আমি যাই?

—এস।—তার মাথায় হাত দিয়ে সোমনাথ বললে, আশীর্বাদ করবার যোগ্য নই। তবে প্রার্থনা করি যেন শান্তি পাও।

এতক্ষণ ক্ষান্ত কাঁদেনি। এবার কিন্তু সে সোমনাথের দুই পায়ে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল।

সোমনাথ তার দিকে চেয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

নিরাপদে নৌকোয় উঠেছে গৌরী।

পুলিশ লঞ্চকে প্রতারিত করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। মাইল দুই দূরে জনকতক লোক দেবীর নাম ধরে কোলাহল সুরু করতেই লঞ্চ সেদিকে ছুটে গিছল। ইতিমধ্যে গৌরী নৌকায় উঠে অগ্রসর হ'ল সমুদ্রাভিমুখে।

পণ্ডিতের স্কুল বাড়ীই হয়েছিল পুলিশের ছাউনি।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ আত্মসমর্পণ করলে। মিঃ ধাড়া ছাউনির ভিতরে ছিলেন। সংবাদ পেয়েই ছুটে এলেন। আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, কম্যুনিষ্টদের নেতা নিজেই এসেছে? very good! নেত্রীটি কোথা?

—অনর্থক সে প্রশ্ন করছেন কেন? জানেন তো উত্তর পাবেন না।—সোমনাথ বললে।

চোখ দুটি বিস্ফারিত করে ধাড়া বললেন, উত্তর পাব না? এখনো দম্ভ যায়নি দেখছি! আচ্ছা, কি করে কম্যুনিষ্টদের সায়েস্তা করতে হয়, তা আমি জানি। উত্তর তখন আপনিই বেরিয়ে আসবে।

—চেষ্টা করে দেখুন।—সোমনাথ বললে মৃদু হেসে, কিন্তু আপনি আমাকে কম্যুনিষ্ট বলছেন কেন?

—কম্যুনিষ্ট নন্ আপনি? সাম্যবাদে আপনি বিশ্বাস করেন না? —ধাড়া বললেন কর্কশ কণ্ঠে।

—করি। কিন্তু সাম্যবাদে বিশ্বাসী হ'লেই কি কম্যুনিষ্ট হয়?—সোমনাথ বললে, স্বামীজীও তো বলেছিলেন, "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে। বেরুক, কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।" তাঁকে কি বলবেন মিঃ ধাড়া? কম্যুনিষ্ট?

ধাড়া রাগে কাঁপছিলেন।

সোমনাথ হাসল। বললে, যাই বলুন তাতে কিছু আসে যায় না। আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার নতুন নয় আর আপনাদের সায়েস্তা করবার পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং ওই ভয়টা না দেখালেই ভালো হ'ত।

—এরকম লম্বা লম্বা কথা আমি জীবনে কখনো বরদাস্ত করিনি।

—এখনো করবেন না।—সোমনাথ বললে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য আপনার হাতের কাছে সব রকমের সুযোগই আছে। প্রাণভরে সেগুলির সদ্ব্যবহার করুন। চাষীদের জীবন-মরণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাকে আপনি যখন কম্যুনিষ্ট মুভমেণ্ট ব'লে চালাতে পেরেছেন তখন বাকীটুকুও অনায়াসে পারবেন। আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না। শুধু আমার বিশ্বাসটুকু আপনার কাছে ব্যক্ত করে রাখব। আমার কথায় নয়, স্বামীজীরই কথায়ঃ "অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যত ভারত। তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে। অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া রেখো।" হাওয়ায় বিলীন হওয়ার আগে অকপট বিশ্বাসে তাঁর বাণী আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিলুম।

ধাড়া চীৎকার করে উঠলেন, পাহারা!

বন্দুকধারী পুলিশ সোমনাথকে ঘিরে রেখেছিল। ধাড়ার ইঙ্গিতে তারা তাকে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চলল ভিতরে।

ধাত্রীর বুকে অসংখ্য বুদ্বুদ জাগছে আর ফেটে যাচ্ছে।
ক্ষণকালের বিলাস!
সেন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তখনো খুঁজছে দেবীর সন্ধান।

শেষ